সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
অন্য দেশের কবিতা

অন্য দেশের কবিতা

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

সাগরময় ঘোষ
শ্রদ্ধাস্পদেষু

এই লেখকের অন্যান্য বই

আমার স্বপ্ন
আমি কী রকম ভাবে বেঁচে আছি
কবিতাসমগ্র ১ম
কবিতাসমগ্র ২য়
নীরা হারিয়ে যেও না
বাতাসে কিসের ডাক শোন
রবীন্দ্রনাথকে নিবেদিত (সম্পাদিত)
সাদা পৃষ্ঠা তোমার সঙ্গে
সুন্দরের মন খারাপ মাধুর্যের জ্বর
স্মৃতির শহর
হঠাৎ নীরার জন্য

সূচীপত্র

অন্য দেশের কবিতা : বিংশ শতাব্দী

প্রথমেই জানিয়ে রাখতে চাই যে, এই বইতে যাঁরা বিশুদ্ধ কবিতার রস খুঁজতে যাবেন, তাঁদের নিরাশ হবার সম্ভাবনাই খুব বেশী। এ বইতে কবিতা নেই, আছে অনুবাদ কবিতা। অনুবাদ কবিতা একটা আলাদা জাত, ভুল প্রত্যাশা নিয়ে এর সম্মুখীন হওয়া বিপজ্জনক। অনুবাদ কবিতা সম্পর্কে নানা ব্যক্তির নানা মত আছে, আমি এতগুলি কবিতার অনুবাদক, তবু আমার ব্যক্তিগত দৃঢ় বিশ্বাস, অনুবাদ কবিতার পক্ষে কিছুতেই বিশুদ্ধ কবিতা হওয়া সম্ভব নয়, কখনো হয়নি। কোলরিজ বলেছিলেন, একটি কবিতার সেইটুকুই বিশুদ্ধ কবিতা, যার অনুবাদ সম্ভব নয়। —সেই বিশুদ্ধ ব্যাপারটি কি তা বুঝতে হলে, আর একটি বিশুদ্ধ কবিতা পড়ে দেখতে হবে, আজ পর্যন্ত কোনো সমালোচক তার বর্ণনা করতে পারেননি। কবিতার সংজ্ঞা, ব্রহ্মেরই মতন, অনুচ্ছিষ্ট। সংজ্ঞা না হোক, এই সরল সত্যটি সর্ববিদিত যে, কবিতার প্রধান বৈশিষ্ট্য তার শব্দ ব্যবহার, বিংশ শতাব্দীর কবিতা সঙ্গীতের প্রভাব কাটিয়ে শব্দের গভীর অর্থের প্রতিই বেশী মনোযোগী, এবং এক ভাষার শব্দ চরিত্র অপর ভাষায় হুবহু প্রকাশ করা একেবারে অসম্ভব।

আর একটি স্বীকারোক্তি এই যে, আমি পাঁচটি প্রধান ইওরোপীয় ভাষার কবিতা এখানে উপস্থিত করেছি, কিন্তু এই ভাষাগুলির কোনোটিই আমি সম্যক অবগত নই। ইংরেজিতে নানান্ দ্বি-ভাষা সংস্করণ পাওয়া যায়, আমার প্রধান অবলম্বন সেইসব গ্রন্থাবলী, যেখানে তাও পাওয়া সম্ভব হয়নি, সেখানে শুধু ইংরেজির মাধ্যম থেকেই আহরণ করেছি। মূল ভাষা না জেনে অনুবাদ করার প্রচেষ্টা, গুরুতর ধৃষ্টতা বা অপরাধ হিসেবে গণ্য হতে পারে। কিন্তু এজন্য আমি নিজেকে তেমন অপরাধী হিসেবে মনে করি না, তার প্রথম ছোট কারণ, শব্দের সৌকুমার্য যখন ভাষান্তরিত করা অসম্ভব, তখন মূল ভাষা জানার প্রশ্ন জরুরি নয় ; দ্বিতীয়ত, আমার আগে এই ধরনের অনুবাদের কাজ বাংলাদেশে করেছেন আরও অন্তত পঞ্চাশজন কবি, যাঁদের শিরোভাগে আছেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। বাংলাদেশে যাঁরা বিদেশী ভাষায় পণ্ডিত তাঁরা হয় কবিতার অনুবাদ করতে চান না, অথবা কবিতা অনুবাদ করার যোগ্যতা নেই তাঁদের। কিন্তু বিদেশের কবিতার সঙ্গে বাঙালি পাঠকদের এইজন্যই পরিচিত হওয়া প্রয়োজন যে, তাতে সাম্প্রতিক বাংলা কবিতা বুঝতে সুবিধে হবে এবং অহেতুক হীনমন্যতা বা অহংকার কেটে যাবে। সুতরাং, কবিরাই যতদূর সম্ভব প্রস্তুত হয়ে এ-কাজ করছেন। তা ছাড়া, আমার বিশ্বাস, কবিতা পড়ে বোঝার মতন বিদেশীভাষার জ্ঞান খুব কম লোকের পক্ষেই আয়ত্ত করা সম্ভব, অনুবাদ করা তো দূরের কথা। যে-ইংরেজি ভাষার সঙ্গে আমরা আবাল্য পরিচিত, সেই ইংরেজি কবিতারও সম্পূর্ণ রস আমরা পাই কিনা, সে সম্পর্কে ঘোর সন্দেহ এখনো আমার রয়ে গেছে। সমালোচকের সমর্থন না পেয়ে, কোনো নবীন ইংরেজ কবিকে আমরা এখানে প্রশংসা করতে সাহস পাই না। অন্যদিকে, বহু বিশ্ববিখ্যাত ইংরেজ কবিকেও কোনো অজ্ঞাত কারণে গোপনে খারাপ লাগে। অন্যভাষার কবিতার মূল কবিত্ব থেকে পাঠককে বঞ্চিত থাকতেই হয়, যেটুকু পাই, তা হলো কবিতার ভিতরের গল্পটুকু, অর্থাৎ বর্ণিত বিষয়ের প্রতি কবির মনোভাব, তাঁর চিন্তার ভঙ্গি, বাক্য গঠনের বৈশিষ্ট্য, নতুন ধরনের কলাকৌশল, সভ্যতা বা ব্যক্তি-জীবন সম্পর্কে তাঁর দর্শন। এইগুলি জানার জন্য, তিন বছর বা পাঁচ বছর শেখা জার্মান ভাষায় জার্মান কবিতা পড়ে যেটুকু উপকৃত হওয়া যায়, তার চেয়ে ঢের বেশি উপকৃত হওয়া সম্ভব পঁচিশ-তিরিশ বছর ধরে শেখা ইংরেজি ভাষায় জার্মান কবিতা পড়ে। তারচেয়েও বেশী সুবিধাজনক, মাতৃভাষায় জার্মান কবিতার অনুবাদ পড়া। সুতরাং বিশুদ্ধ কবিতা আস্বাদনের তৃষ্ণা বিশুদ্ধ বাংলা কবিতাতেই নিবদ্ধ রেখে, কিংবা আপাতত ভুলে গিয়ে, উপরোক্ত বিষয়গুলি সম্পর্কেই শুধু যাঁরা কৌতূহলী হবেন, তাঁদের কাছে এই অনূদিত কবিতাবলী অকিঞ্চিৎকর হয়তো মনে হবে না।

কবিতার অনুবাদ গুণ সম্পর্কে আমি ঘোরতর অবিশ্বাসী হয়েও কেন এতগুলি কবিতার অনুবাদ করেছি—সে কারণও আমি জানাচ্ছি। শ্রদ্ধেয় সাগরময় ঘোষ দেশ পত্রিকার জন্য বিদেশী

কবিতার অনুবাদ করতে আমায় অনুরোধ করেন। অনেক বুদ্ধিমান ব্যক্তিরও মানুষ চিনতে দু-একবার ভুল হয়ে যায়, হয়তো সেইরকম কোনো ভুলের বশেই তিনি আমার মতো অযোগ্য ব্যক্তিকে এরকম গুরুতর কাজের জন্য বেছেছিলেন। তিনি না বললে, এরকম কোনো পরিকল্পনাই আমার ছিল না। কিন্তু আমি এ দায়িত্ব নিতে যে পরাঙ্মুখ হইনি, তার কারণ আগেই বলেছি, এ-কাজটাকে আমি খুব গুরুতর মনে করি না। আমি নিজে যেমন অনুবাদ কবিতার কাছে বিশেষ কিছু দাবি করি না, যা দাবি করি, (উপরে উল্লেখ করা হয়েছে) তা আমার পক্ষেও পরিবেশন করা সম্ভবত শক্ত নয়। এখানে বিশেষ কোনো প্রতিভা বা মেধার প্রশ্ন নেই, প্রয়োজন শুধু পরিশ্রম। আমাদের দেশের শিক্ষিত লোকেরা সাধারণত ইংরেজি কবিতাই পড়েন, কিন্তু সাম্প্রতিক পৃথিবীর সাহিত্যে সমৃদ্ধি ও বৈচিত্র্যে ইংরেজি কবিতার স্থান অনেক নিচুতে। আলস্যবসে, কিংবা সুলভ নয় বলেই আধুনিক ফরাসী-জার্মান-ইতালিয়ান ইত্যাদি কবিতার অনুবাদ সাধারণ পাঠকদের চোখে পড়ে না। আমি সেই সব ভাষার আধুনিক কবিদের নির্বাচন করে, জীবনী সাজিয়ে, সাহিত্যে আন্দোলনগুলির পরিচয় জানিয়ে ধারাবাহিক ভাবে কবিতার সচ্ছন্দ অনুবাদ প্রকাশ করেছি মাত্র। আমার কৃতিত্ব শুধু পরিশ্রমের। আর কিছু না।

পত্রিকায় প্রকাশের সময়, একজন অচেনা তরুণ আমায় চিঠি লিখে কৈফিয়ৎ চেয়েছিলেন এই বলে যে, আমি আমেরিকা মহাদেশে নিমন্ত্রিত হয়ে গিয়েছিলুম বাংলা কবিতা অনুবাদ করার জন্য, সেখানে সে-কাজ না করেই ফিরে এসেছি, অথচ দেশে ফিরেই অন্য দেশের কবিতা বাংলায় অনুবাদ করতে শুরু করেছি কেন ? উত্তর খুব সরল। আমি ইংরেজি জানি না, কিন্তু বাংলা ভাষা জানি। সাহিত্য পদবাচ্য হবার মতন ইংরেজি আমার পক্ষে ইহজীবনে লেখা সম্ভব নয়, ইংরেজি থেকে যে-কোনো বিষয় আমার পক্ষে নির্ভুল বাংলায় প্রকাশ করা সম্ভব। এ কথাটা জানার জন্য আমার পক্ষে আমেরিকা পর্যন্ত যেতে হলো কেন ? যাবার সুযোগ পেলে কে না যায় ? তাছাড়া, বিদেশে গিয়েই স্পষ্টভাবে বুঝতে পেরেছিলাম, অন্য ভাষায় লেখার চেষ্টা বা অনুবাদ করার চেষ্টার মধ্যে অত্যন্ত দীনতার ভাব প্রকাশ পায়, আমি এ রকম চেষ্টা আর কখনো করবো না। ইংরেজি ভাষা আমাদের পক্ষে লাভজনক, কিন্তু সম্মানজনক নয়। পরভাষায় সাহিত্য সৃষ্টির প্রচেষ্টায় সার্থক হয়েছে পৃথিবীতে এ-রকম উদাহরণ এ পর্যন্ত দু'তিনজন মাত্র, আমাদের ভারতবর্ষ থেকে এখনো একজনও না। শুভাচার বা অনাচার শুধু মাতৃভাষাতেই সম্ভব।

কবির কাছে তাঁর কবিতার প্রতিটি শব্দই মূল্যবান ও অবধারিত। সেইজন্য কবিতার অনুবাদ আক্ষরিক হওয়াই অনেকের মতে বাঞ্ছনীয়। কিন্তু সম্পূর্ণভাবে আক্ষরিক অনুবাদ যে অসম্ভব—তা তো বলাই বাহুল্য, একই কবিতার তিনজনের করা আলাদা অনুবাদ দেখলেই তা টের পাওয়া যায়। আবার এর চরম বিপরীত উদাহরণ দেখিয়েছেন 'ইমিটেসান্‌স' বইতে রবার্ট লোয়েল। সেখানে তিনি বিখ্যাত বিদেশী কবিদের রচনা অনুবাদ করেছেন সম্পূর্ণ নিজের মতন করে, লাইন ভেঙে-চুরে, উল্টে-পাল্টে। এমন কি, বোদলেয়ারের কবিতায় পারম্পর্য বোঝাবার জন্য দুটি নিজস্ব স্তবক পর্যন্ত জুড়ে দিয়েছিলেন। তাঁর বক্তব্য, মূলের স্বাদ যখন পাওয়া যাবেই না, তখন অনূদিত কবিতাটি যেন মৌলিক কবিতা হয়ে ওঠে যে কোনো প্রকারে। আমার অনুবাদের পদ্ধতি এইরকম : আমি প্রথমে মূল কবিতা ও ইংরেজি অনুবাদ পাশাপাশি রেখে যতদূর সম্ভব আক্ষরিক অনুবাদ করেছি, তারপর প্রুফ দেখার সময় মূল কবির কথা প্রায় ভুলে গিয়ে, রচনাটি যাতে বাংলায় সুসহ হয় এইজন্য বেপরোয়াভাবে শব্দ কেটেছি ও বদলেছি। ফলাফল এখনো দুর্বোধ্য। যে-সমস্ত কবিদের রচনা বাংলায় আগেও অনূদিত হয়েছে, আমি যতদূর সম্ভব সেই সমস্ত বাঙালি অনুবাদকদের নাম উল্লেখ করে দিয়েছি। এবং বিদেশের কবিতা সম্পর্কে যাঁরা সত্যিকারের উৎসাহী, তাঁরা অবশ্যই শঙ্খ ঘোষ ও অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত সম্পাদিত 'সপ্তসিন্ধু দশদিগন্ত' সংকলনটি সংগ্রহ করে পড়ে দেখবেন, সেখানে আমার চেয়ে যোগ্যতর ব্যক্তিদের করা আরও বহু দেশের বহু সংখ্যক কবিতার অনুবাদ গ্রথিত হয়েছে। আমার এই বইটির যেটুকু আলাদামূল্য, তা হলো, পৃথিবীর প্রধান পাঁচটি ভাষার আধুনিক সাহিত্য আন্দোলন, মুখ্য চিন্তা, প্রধান কবিদের

জীবনী, হৃদয়ের সংবাদ, দুরূহ প্রয়োগের টীকা ইত্যাদি সংক্ষেপে এক সঙ্গে উপস্থিত করা হয়েছে। অন্য দেশের কবিতা বুঝতে এগুলি নিশ্চিত সহায়ক। প্রত্যেক ভাষা নিয়ে আলাদা বই বার করলে কাজ আরও সুষ্ঠু সম্পূর্ণ হতো। আশা করে রইলুম, অন্য কেউ পরে সে কাজ করবেন।

এ বই পড়ে পাঠকদের যদি কোনো লাভ হয়, খুবই সুখের কথা। আমার অন্তত যথেষ্ট উপকার হয়েছে। প্রায় একবছর ধরে নানান দেশের কবিদের রচনা ও জীবনের সঙ্গে জড়িত থেকে তাদের সঙ্গে কী-রকম যেন আত্মীয়তা হয়ে গেছে। এই গ্রন্থের অনেক কবিকে এখন আমার ব্যক্তিগত বন্ধুর মতন মনে হয়।

কবিদের নির্বাচন করার সময় কখনো সমালোচকদের সাহায্য, কখনো ব্যক্তিগত রুচির উপর নির্ভর করেছি। স্প্যানীশ কবিতায় গেব্রিয়েলা মিস্ত্রাল কিংবা জার্মানি কবিতায় নেলী শাখস্-এর রচনা আমি গ্রহণ করিনি, কারণ ওঁদের খ্যাতি ও সম্মানের কারণ শুধু সাহিত্য নয়। আবার, ফরাসী কবিতায় সুররিয়ালিজম আন্দোলনের নেতা ও প্রবক্তা আঁদ্রে ব্রেঁতো কিংবা ইতালির ফিউচারিজম আন্দোলনের হোতা ফিলিপ্পো মেরিনেত্তি—যাঁদের কাছে ঋণ স্বীকার করেছেন পৃথিবীর সমকালের মহাকবিরা—এঁদের কবিতা যে আমি অন্তর্ভুক্ত করিনি, তার কারণ, সাহিত্যে এঁরা নতুন দর্শনের সৃষ্টি করে গিয়েছেন, কিন্তু কবি হিসেবে কালোত্তীর্ণ হতে পারেননি। সাহিত্য সম্পর্কে তাঁদের ইস্তাহারগুলি ইতিহাসের সামগ্রী হতে পেরেছে, তার থেকে কিছু নমুনা এখানে উদ্ধার করছি।

ফিউচারিস্টিক মেনিফেস্টো

১. বিপদকে ভালোবাসা, বিপদের অভ্যাস এবং হঠকারী দুঃসাহসের গান আমরা গাইতে চাই।
২. আমাদের কবিতার মূল উপাদান হবে, সাহস, অকুতোভয়তা এবং বিদ্রোহ।
৩. চিন্তামগ্ন জড়তা, আনন্দ এবং ঘুম—সাহিত্য এ পর্যন্ত এগুলোকেই উদ্ভাসিত করে দেখিয়েছে। এবার আমরা তুলে ধরবো, আক্রমণ, আচ্ছন্ন অনিদ্রা, খেলোয়াড়ের পদক্ষেপ, বিপজ্জনক লাফ, কানমলা এবং ঘুষোঘুষি।
৪. আমরা ঘোষণা করছি যে পৃথিবীর বিস্ময় সম্প্রতি ধনী হয়েছে এক নতুন সৌন্দর্যে : গতির সৌন্দর্য। কামানের গোলার মধ্যে দিয়ে ছুটে যাওয়া একটি গর্জমান মোটরগাড়ি "ভিকট্রি অব সামোথরেসের" চেয়ে অনেক বেশী সুন্দর।
৫. স্টিয়ারিং হুইল ধরে আছে সে মানুষ তার গান গাইতে চাই—যার আদর্শ দণ্ড ভেদ করে যাচ্ছে পৃথিবী, যে তার নিজস্ব কক্ষপথে ঘূর্ণ্যমান।
৬. বিলাসী অপব্যয়, উজ্জ্বলতা ও তাপে কবি নিজেকে নিঃশেষ করতে বাধ্য—যাতে আদিম উপাদানগুলির জ্যোতি উজ্জীবিত হয়।
৭. যুদ্ধ ছাড়া আর কোথাও কোনো সৌন্দর্য নেই। আক্রমণকারীর চরিত্র ছাড়া কোনো মহৎ সৃষ্টি সম্ভব নয়। কবিতাকে হতে হবে অজ্ঞাত শক্তির বিরুদ্ধে হিংস্র আঘাত যাতে তারা মানুষের পায়ের কাছে এসে লুটিয়ে পড়ে।
৮. আমরা সমস্ত শতাব্দীর দূর উপকূলে দাঁড়িয়ে আছি! আমাদের তো কাজ অসম্ভবের রহস্যময় দ্বার ভেঙে ফেলা, সুতরাং পেছনে তাকিয়ে কি লাভ? টাইম এবং স্পেস গতকাল মারা গেছে। আমরা এখনি বেঁচে আছি অনন্তের মধ্যে, কারণ আমরা ইতিমধ্যে সৃষ্টি করেছি শাশ্বতের সদা জাগ্রত গতি।
৯. আমরা গৌরবময় করতে চাই যুদ্ধ—যুদ্ধেই পৃথিবীর একমাত্র স্বাস্থ্য ভালো থাকে—সামরিক শাসন, দেশাত্মবোধ, সন্ত্রাশবাদীর ধ্বংসচেষ্টা, হত্যার মহৎ আদর্শ, নারীর ঘৃণা।
১০. মিউজিয়াম, লাইব্রেরিগুলো ধ্বংস করবো আমরা, যুদ্ধ করতে হবে নীতিবাদ, নারীর স্বাতন্ত্র্য আর সব সুবিধাবাদী, উপকারবাদী কাপুরুষতার বিরুদ্ধে—ইত্যাদি।

ফিলিপ্পো মেরিনেত্তি এই ইস্তাহারের অনেকখানিই এখন ছেলেমানুষী মনে হতে পারে। কিন্তু এর সারবস্তু, পুরনো বিশ্বাসের প্রতি উচ্চারিত বিদ্রোহ ও ভাঙনের আহ্বান অন্যান্য প্রতিভাবান কবিদের প্রেরণা দিয়েছিল একসময়। এই ছেলেমানুষীর বশেই মেরিনেত্তি কবিতায় আঙ্গিকে যে-সব উদ্ভট ভাঙাচোরা ও রীতিবদলের চেষ্টা করেছিলেন, তাতে তাঁর নিজের কবিতা সার্থক হয়নি কিন্তু অপর কবিদের নতুন রীতি প্রণয়নে সাহায্য করেছে। মেরিনেত্তি নিজের কাছেও পরাজিত হয়েছিলেন শেষ পর্যন্ত, এত সব বিদ্রোহের কথার পরও—তিনি স্বয়ং যোগ দিয়েছিলেন মুসোলিনীর ফ্যাসিস্ত দলে, প্রচুর খেতাব ও সরকারী সম্মান পেয়ে ব্যর্থসুখে কাটিয়েছেন বৃদ্ধ বয়েস। ফিউচারিস্ট ম্যানিফেস্টো প্রথম ছাপা হয়েছিল প্যারিসে, ১৯০৯ সালে।

আঁদ্রে ব্রেঁতো-র সুররিয়ালিস্ট মেনিফেস্টো—প্রথম ছাপা হয়েছিল ১৯২৪-এ, তারপর তিনি আবার লিখেছিলেন দ্বিতীয় মেনিফেস্টো, দীর্ঘদিন পরে তিনি আবার সমগ্রভাবে সুরারিয়ালিজমের মুখ্য উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে লেখেন। সে দীর্ঘ রচনার অনুবাদ এখানে সম্ভব নয়, তবে তার সারমর্ম আমি বিভিন্ন সুররিয়ালিস্ট কবিদের সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছি।

ছোট ছোট শাখা আন্দোলনগুলির প্রতিভূ হিসেবে আমি একজন বা দুজনকে বেছে নিয়েছি; কিন্তু সব সময় তাঁরাই যে সে দলের শ্রেষ্ঠ কবি এমন নয়। যাঁদের কবিতা অনুবাদে কিছুই বোঝা যায় না, তাঁদের বাদ দিয়ে আমার পক্ষে সুবিধাজনকদেরই নির্বাচন করেছি। যেমন জার্মানিতে অগুস্ট স্ট্রাম একজন প্রধান কবি, কিন্তু তাঁর কবিতা অনুবাদে প্রায় অর্থহীন দাঁড়ায়, এইরকম :

যুদ্ধক্ষেত্র

উৎপন্ন কাদা ফিসফিসিয়ে লোহাকে ঘুম পাড়ায়
রক্ত চাপ বাঁধে যেখান থেকে তারা গড়াচ্ছিল
মরচে গুঁড়োয়
মাংস থিক থিক
লোভ চোষে ক্ষয়ের চারপাশে।
হত্যার ওপর হত্যা
চোখ মারে
ছেলেমানুষী চোখে।

অনেক কবির দীর্ঘ কবিতা সম্পূর্ণ অনুবাদ করতে পারিনি, কারণ আমি ধৈর্যহীন। তবে, তথ্য, তারিখে যাতে ভুল না থাকে সে সম্পর্কে যথাসম্ভব চেষ্টা করেছি। তা সত্ত্বেও যদি কোনো ত্রুটি কারুর চোখে পড়ে সে সম্পর্কে আমাকে উপদেশ বা পরামর্শ জানালে কৃতার্থ চিত্তে গ্রহণ করবো। অকপটে স্বীকার করি, নিজের অযোগ্যতা সম্পর্কে আমার কোনো ভুল ধারণা নেই এবং সত্যিই খুব সঙ্কোচের সঙ্গে এই বইটি প্রকাশ করছি।

নানা সময়ে আমাকে বই দিয়ে সাহায্য করেছেন নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, শঙ্খ ঘোষ, শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়, প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত, উৎপলকুমার বসু, জ্যোতির্ময় দত্ত, বেলাল চৌধুরী, শুদ্ধশীল বসু। তাঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

ফরাসী কবিতা : সুররিয়ালিজমের উন্মেষ

ত্রিস্তান জারা নামে একজন তরুণ রুমানিয়ান, উদ্বাস্তু হয়ে এসেছিলেন সুইটসারল্যান্ডে। জুরিখের 'ক্যাবারে ভলতেয়ার' নামে এক রেস্তোরাঁয় ত্রিস্তান নিজের বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে সাহিত্য-আন্দোলনের নামে প্রচুর হই-হুল্লোড় শুরু করে দিলেন। তখন প্রথম মহাযুদ্ধ সদ্য শেষ হয়েছে। মানুষের বিশ্বাস, নীতি, আশা, মমতাবোধ বিপন্নধ্বংসের কাছে। বস্তুত, প্রথম মহাযুদ্ধের আঘাত পৃথিবীর মানুষের কাছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের চেয়েও অনেক বেশী প্রচণ্ডভাবে লেগেছিল—কারণ, সেই প্রথম সভ্য পৃথিবীতে ব্যাপক মহাযুদ্ধ—তাও দীর্ঘদিন শান্তির পর, অকস্মাৎ। যুদ্ধের নিদারুণ নিষ্ঠুরতায় বহু সাধারণ মানুষ এমনিতেই পাগল হয়েছিল—সুতরাং কবি-শিল্পীদের মধ্যে খানিকটা পাগলামি দেখা দেবে—সেটা খুব অস্বাভাবিক নয়। ত্রিস্তান জারা তাঁর পাগলামির আন্দোলনের নাম দিয়েছিলেন ডাডা (পরে ডাডাইজম নামে পরিচিত)—কথাটা ডিকশনারি থেকে হঠাৎ তুলে নেওয়া, চলতি অর্থ খেয়াল-খুশিতে যা ইচ্ছে করা, অর্থাৎ কথাটার কোনো মানে নেই—সেইটাই ওঁরা চেয়েছিলেন, ত্রিস্তান চেয়েছিলেন তাঁর আন্দোলনের কোনো উদ্দেশ্য থাকবে না, কোনো অর্থ না, কোনো কারণ না—সম্পূর্ণ নৈরাজ্য।

কিন্তু ত্রিস্তান ভেবেছিলেন, তাঁর আন্দোলন একটা বিশাল বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা। খুব লম্বা লম্বা চিঠি লেখা তাঁর স্বভাব ছিল, এন্তার চিঠি লিখতে লাগলেন জার্মানী, ফ্রান্স, আমেরিকার তরুণ লেখক-শিল্পীদের কাছে—তাঁর বিপ্লবে যোগদান করার জন্য। শেষ পর্যন্ত জুরিখ শহর তাঁর কাজের তুলনায় খুব ছোট জায়গা মনে হওয়ায়, সদলবলে চলে এলেন সভ্যতার মুকুটমণি প্যারিসে।

এই সময় প্যারিসে একজন ডাক্তারি ছাত্র, আঁদ্রে ব্রেতোঁ তাঁর কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে—লুই আরাগঁ, পিলিপ সুপো ইত্যাদি—একটি চটি পত্রিকা বার করতেন, নাম 'সাহিত্য'। এই তরুণ দল ছিলেন কিছুটা বিক্ষুব্ধ, প্রতিষ্ঠিত লেখকদের প্রতি আস্থাহীন, অস্থির, ক্রুদ্ধ। পল ভালেরির মতো মহৎ কবিও তখন অ্যাকাডেমিতে সদস্যপদ পাবার জন্য তদারকিতে ব্যস্ত, সুতরাং তরুণরা ওঁর প্রতি খানিকটা নিরাশ, পল ক্লোদেলের মতো বড় কবিও তখন সদ্য ক্যাথলিক হয়ে চরম গোঁড়া হয়ে উঠেছেন—(আঁদ্রে জিদ ক্লোদেল সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন, 'উনি আগে ছিলেন সূক্ষ্ম পেরেক, এখন হয়েছেন হাতুড়ি!') এবং আঁদ্রে জিদ—যাঁর রচনায় তরুণরা অনেক সময় আত্মপ্রতিকৃতি দেখতে পেয়েছে—তিনিও কিছুটা ঈষদুষ্ণ। একমাত্র যে বিশাল, দুর্দান্ত, বল্গা-হীন, কুসুম-কোমল কবিকে (তখন প্রায় অপরিচিত) তরুণরা মনপ্রাণ সঁপে ছিল, সেই গীয়ম আপোলীনেয়ার যুদ্ধ থেকে মাথায় গোলার আঘাত নিয়ে ফিরে, যুদ্ধ বন্ধ হবার ঠিক আগের দিন হাসপাতালে মারা গেলেন। আর, মার্শেল প্রুস্ত যদিও 'সাহিত্য' কাগজে লিখলেন না—কিন্তু বারো পাতার চিঠি লিখে সমর্থন জানালেন।

সুতরাং ত্রিস্তান জারার হই-হই দলের সঙ্গে প্যারিসের যুবারা এক সঙ্গে মিলে গেলেন। শুরু হল ডাডাইজমের নামে অনেক উদ্ভট কাণ্ড, রাস্তাঘাটে গোলমাল, থিয়েটারে গিয়ে চেঁচামেচি, পথের উপর বসে পড়ে কবিতা লেখা—খবরের কাগজের দৃষ্টি আকর্ষণ করার যাবতীয় চেষ্টা। ত্রিস্তান জারার বিখ্যাত উক্তি, 'সব রকম নিয়মের অভাবও একটা নিয়ম—এবং সেটাই শ্রেষ্ঠ নিয়ম'—তরুণদের খুব মনে লেগেছিল।

কিন্তু ফরাসী দেশে রাজনৈতিক আন্দোলনেও বহু রকম পাগলামি প্রশ্রয় পেতে পারে—কিন্তু সাহিত্য-আন্দোলনে সাহিত্য ছাড়া অন্য উপসর্গ বেশীদিন মনোযোগ পায় না। ত্রিস্তানের নৈরাজ্য অবিলম্বেই একঘেয়ে হয়ে গেল। তখন আঁদ্রে ব্রেতোঁ তাঁর দলবল নিয়ে সরে দাঁড়ালেন, শুরু করলেন নতুন শিল্প-আন্দোলন, ১৯২৪-এ প্রকাশিত হল প্রথম সুররিয়ালিজমের ইস্তাহার। এবং সুররিয়ালিজম এ শতাব্দীতে এ পর্যন্ত সবচেয়ে মূল্যবাদ শিল্পদর্শন।

সুররিয়ালিজম শব্দটা ব্রেতোঁ পেয়েছিলেন আপোলীনেয়ারের রচনায়—কিন্তু এর বীজ ছিল আরও অনেক আগে হ্যাম্বোর লেখায় বা আরও আগে নার্ভাল, বালজাকের মধ্যে। পৃথিবীর সেই চরম বিস্ময়কর কবি, দুর্দান্ত বখাটে বালক হ্যাম্বো—আজ সুররিয়ালিজমের প্রধান পুরুষ, সিমবলিস্টদের প্রধান হিসেবে খ্যাত, এমনকি এক্‌জিস্‌টেনসিয়ালিজমের প্রবক্তা হিসেবেও গণ্য, আবার ক্লোদেল ওঁর রচনা পড়েই ক্যাথলিক হবার প্রেরণা পেয়েছেন। (Rimbaud বাংলায় লেখা হয় র‍্যাঁবো। কিন্তু দেখেছি ফরাসীরা ও উচ্চারণ শুনে চিনতেই পারে না। ওরা যেভাবে উচ্চারণ করে—সেটা বাংলায় লিখলে অনেকটা শোনায় হ্যাম্বো। আমি বিদেশী উচ্চারণের ব্যাপারে খুঁতখুঁতে নই, জ্ঞানও খুবই কম, নিতান্ত নতুনত্বের লোভেই র‍্যাঁবোর বদলে হ্যাম্বো লিখতে মাঝে মাঝে লোভ হয়।)

সুররিয়ালিজমের মূল বক্তব্য, কবিকে হতে হবে দ্রষ্টা, সে শুধু ভবিষ্যৎ দেখবে না—দেখবে নিজের অন্তঃকরণ, ছায়া, মগ্নচৈতন্য—হৃদয় খুঁড়ে জাগাবে বেদনা, স্বপ্ন, দুঃস্বপ্ন, ললাটলিপির মতো যুক্তিহীনতা। এই সময় সিগমুণ্ড ফ্রয়েড এনে দিয়েছিলেন অবচেতনার ধারণা, ব্রেতোঁ নিজেও ছিলেন মনোবিজ্ঞানী—সেই থেকে আসে লুপ্ত স্মৃতি পুনরুদ্ধারের চেষ্টা, মাদক সেবনের পর পারম্পর্যহীন প্রতিফলনের লিখিত রূপ—অটোমেটিক রাইটিং বা কলম হাতে নিয়ে বসে থাকার সময় যাবতীয় বিদ্যুৎস্মৃতি ধরে রাখা। সব প্রয়াস সফল হয় না, কিন্তু বহু দুর্লভ কবিতা বা ছবি এর থেকে বেরিয়ে এসেছে। অবচেতনের উদ্ধার—এ ছাড়া স্বর্গ ও পৃথিবীকে মেলাবার আর কোনো উপায় নেই সাহিত্যে।

আমাদের ভারতবর্ষে সুররিয়ালিজমের প্রভাব যথাকালে আসেনি। অথচ এ তো ভারতবর্ষেরই। সুররিয়ালিজমের মূল খুঁজতে অনেকে চলে গেছেন প্রাচীন গ্রীসে—যেখানে ডেল্‌ফির দেবতা সক্রেটিসকে বলেছিলেন, 'নিজেকে জানো'। কিন্তু তারও বহু আগে আমরা শুনেছিলাম 'আত্মানং বিদ্ধি'। ধ্যানের সাহায্যে অপরলোকে উত্থান, শরীর ছাড়িয়ে গিয়ে দৈববাণী শ্রবণ, বেদ যে কারণে অপৌরুষেয়, অ্যালকেমির সমান্তরাল তান্ত্রিক উপাসনা—ইত্যাদি। কিন্তু সাহিত্যে আমরা এগুলো ভুলে গেছি অনেকদিন, সম্ভবত ইংরেজদের প্রভাবে। ইওরোপে যখন আত্মার পুনরাবিষ্কার হয়, আমরা তখনও তাকে গ্রহণ করতে পারিনি।

সুররিয়ালিজমের প্রভাব পড়ে ইওরোপের বিভিন্ন দেশে, ক্রমে বিভিন্ন মহাদেশে—। দলগত আন্দোলন হিসেবে সুররিয়ালিজম বেশীদিন টেকেনি। ক্রমে এসে যোগ দিয়েছিলেন পল এলুয়ার, জাক প্রেভের, আন্টোনিন আর্তো, হ্রেনো শার—প্রমুখ। শিল্পীদের মধ্যে মিরহো, মাক্স আনর্স্ট, চিরিকো, পিকাবিয়া, টালি, ম্যান রে, সালভাদর দালি প্রমুখ। প্রথম দল ভাঙতে শুরু করে, ব্রেতোঁ যখন রাশিয়ার দৃষ্টান্তে কমুনিজম সমর্থন করলেন। পরে অবশ্য, ব্রেঁতোর আশাভঙ্গ হয়েছিল এবং কমুনিজমের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়েছিলেন। কিন্তু তখন ভাঙা দল আর জোড়া লাগেনি। এ ছাড়া, কবিদের মধ্যে যা খুব স্বাভাবিক—ছিল ক্ষমতার লড়াই ও ঈর্ষা—আঁরি মিশোর মতো বড় কবি যেমন ব্রেতোঁর নেতৃত্বে কখনও সুররিয়ালিস্ট আন্দোলনে যোগ দিতে চাননি, বরং প্রকাশ্যে নিন্দে

করেছেন, কিন্তু উত্তরকাল জানে মিশো মনেপ্রাণে সুররিয়ালিস্ট। এ আন্দোলনে চরম আঘাত হানেন ১৯৪০-এ জাঁ পল্ সার্ত্র, তাঁর অস্তিত্ববাদ দিয়ে—নতুন করে জেগে ওঠার জন্য আমেরিকার নির্বাসন ছেড়ে আঁদ্রে ব্রেতোঁ আবার প্যারিসে এসে তাঁর 'সিংহের কেশর' নেড়ে ভাঙা দল জোড়ার চেষ্টা করলেন—কিন্তু, ততদিনে দল ছত্রভঙ্গ হয়ে গেছে।

কিন্তু দল হিসেবে অস্তিত্ব না থাকলেও আদর্শ হিসেবে প্রবলভাবে আছে। সারা পৃথিবীর সচেতন লেখকদের মধ্যে এমন বোধ হয় একজনও নেই—যিনি সুররিয়ালিজমকে পুরোপুরি অস্বীকার করতে পারবেন। যোগাযোগহীন হলেও বাংলাদেশের জীবনানন্দ দাশ এই জাতের কবি। এর পর আর কোনো নতুন সাহিত্য-দর্শন পৃথিবীতে আসেনি। এমন কি ইংলন্ডের অ্যাংরি ইয়ংমেন এবং আমেরিকার বীট জেনারেশন—সেই সুররিয়ালিস্টদেরই বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গের পুনঃপ্রকাশ। সুররিয়ালিস্টদের মধ্যে কে কত বড় লেখক ছিলেন এ নিয়ে তর্ক উঠতে পারে—কিন্তু এদের আদর্শ প্রভাবিত করেছে পৃথিবীর মহত্তম লেখকদের।

সুররিয়ালিস্টদের আর একটি বড় কীর্তি, গদ্যের কবল থেকে কবিতার উদ্ধার। গত শতাব্দী থেকে শুরু হয় গদ্যের প্রবল প্রচার, উপন্যাসের রবরবা—এবং উপন্যাসের প্রধান অবলম্বন হল যুক্তি এবং বাস্তবতাবোধ, প্রতিটি পরিচ্ছেদের সামঞ্জস্য, যার চরম প্রকাশ ডিটেকটিভ নভেলে—যেখানে প্রতিটি কথা এবং প্রত্যেক মানুষের চলাফেরার মধ্যেই একটা ছদ্ম কারণ দেখানোর চেষ্টা। এর সঙ্গে পাল্লা দিতে গেলেই কবিতার সর্বনাশ। ব্রেতোঁ এই জন্য উপন্যাসকে বলতেন 'দাবা খেলা'। কবিতার মুক্তি অলৌকিকে, রহস্যে, স্বপ্নের মতো আপাত যুক্তিহীনতায়। সুররিয়ালিস্টরা এই জন্য আক্রমণ করেছিলেন ধর্মকে (খৃস্টধর্ম)—নিৎসের 'ঈশ্বরের মৃত্যু'ও ঠাট্টা করে উড়িয়ে দিলেন—কারণ ঈশ্বরের মৃত্যু আনতে হলে—ঈশ্বরের অস্তিত্বও মানতে হয়, নচেৎ যা ছিলই না তার মৃত্যু হয় কি করে। খৃস্টধর্মে অলৌকিক বা রহস্যের স্থান নেই, যেমন অডেন 'হোমেজ টু ক্লিয়ো' কবিতায় লিখেছেন :

> A Christian ought to write in prose
> For poetry is Magic......

সুররিয়ালিস্টের দল প্রবলভাবে প্রতিষ্ঠা করলেন রহস্যের, স্বপ্নের, আলোছায়ার (যার প্রভাবে পাশ্চাত্যের বহু লেখক ঝুঁকেছেন হিন্দু ও বৌদ্ধ দর্শনে)—এবং ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিলেন সাহিত্যের তথাকথিত বাস্তবকে—এবং শুধু কবিতায় নয়—এই রহস্যময়তা ছড়িয়ে গেল চিত্রশিল্পে, ফিল্মে, নাটকে—সুররিয়ালিস্টদের অন্যতম প্রধান আন্টোনিন আর্তো আজ পৃথিবীর আধুনিক নাট্যকারদের—ব্রেখট, বেকেট আয়োনেস্কো, জেনে—এঁদের পূর্বপুরুষ হিসেবে স্বীকৃত। এই আক্রমণের হাতে অসহায় হয়ে গিয়ে ফরাসী গদ্যও অনেক যুক্তি ত্যাগ করে আশ্রয় নিল 'নিউ নভেল' আন্দোলনে, এবং সারা পৃথিবীর আধুনিক উপন্যাসই আজকাল আর তথাকথিত বাস্তব বা যুক্তিপ্রধান নয়।

সুররিয়ালিজম আন্দোলন যে আমাদের দেশে যথাসময়ে আসেনি—তাতে যে আমাদের সাহিত্যের কোনো ক্ষতি হয়েছে তা নয়। প্রত্যেক সাহিত্যেরই একটা নিজস্ব গতি আছে, বাংলা সাহিত্য সেই নিজস্ব মহিমায় অগ্রসর হয়েছে, এবং আন্দোলন না হয়েও ব্যক্তির আবিষ্কার চলেছে বাংলা গদ্য ও কবিতায়। সেদিক থেকে কলকাতা-প্যারিস-নিউ ইয়র্ক এক, দান্তে যেমন বলেছিলেন, পৃথিবীর দুই প্রান্তের দুই অচেনা কবি মাঝে মাঝে মুখোমুখি কথা বলে।

গীয়ম আপোলীনেয়ার

[মা পোলিশ, বাবা ইতালীয়ান, উভয়ের বিবাহ হয়নি, আপোলীনেয়ার বাবাকে ভালো চিনতেন না। তিনি নিজের নাম নিজে ঠিক করেছিলেন। জন্ম ১৮৮০, শরীরে এক বিন্দু ফরাসী রক্ত নেই, উচ্চশিক্ষা পাননি, কিন্তু আপোলীনেয়ার খাঁটি ফরাসী কবিদের মধ্যে সর্বোচ্চ শ্রেণীতে। জীবনটা অনেক ব্যর্থ-প্রেমের মালা, বিশাল চেহারা ছিল, আমুদে—হই-হুল্লোড়ে, নিজের উৎসাহে প্রথম মহাযুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন, মাথায় গোলার ঘা খেয়ে ফিরে আসেন, সে আঘাত সারেনি, বিয়ে করলেন—তার ছ' মাস পরেই যুদ্ধ থামার আগের দিন মৃত্যু। ওঁর শব বহে নিয়ে গিয়েছিলেন পিকাসো এবং অন্যান্য শিল্পী-বন্ধুরা। নিজে ছিলেন বলিষ্ঠ শিল্প সমালোচক, কবি হিসেবে জীবিতকালে প্রায় অপরিচিত, এখন খ্যাতির শীর্ষে।

ভালোবাসায় নিবেদিত জীবন

হায় রে আমার পরিত্যক্ত যৌবন
শুকনো ফুলের মালা
এখন অন্য ঋতুর আসার পালা
সন্দেহ আর জ্বালা

নানা ক্যানভাসে এ ছবি সাজানো
নকল রক্তধারা
একটি বৃক্ষে ফুলের মতন ফুটে আছে বহু তারা
নিচে কেউ নেই এক বিদূষক ছাড়া

শীতল রশ্মি পারিপার্শ্বিকে খেলে ঝরে যায়
তোমার চিবুকে ভাসে
গুলির শব্দ চিৎকার উঠে আসে
আঁধারে একটি আঁকা-মুখ একা হাসে

এ ছবির ফ্রেমে বাতাসের কাচ ভাঙা
অচেনা হাওয়ার সুর
ভাবনা এবং ধ্বনির মধ্যে করে এসে ঘুরঘুর
স্মৃতি ও ভবিষ্যতের ভিতরে ঘুরে যায় বহু দূর

হায় রে আমার পরিত্যক্ত যৌবন
শুকনো ফুলের মালা
এখন অন্য ঋতুর আসার পালা
পরিতাপ আর যুক্তির বহু জ্বালা

বন্ধন

চোখের জলে তৈরি করা রজ্জু
সারা ইওরোপ জুড়ে ঘন্টা বাজে
শতাব্দীরা ফাঁসিতে ঝুলছে

আমরা মাত্র দুজন কি তিনজন মানুষ
সমস্ত বন্ধন থেকে মুক্ত
এসো আমরা হাত ধরে থাকি

ভয়ংকর বৃষ্টি চিড়ে যায় ধোঁয়া
দড়ি
পাকানো দড়ি
সমুদ্রের নিচে টেলিগ্রাফের তার
ব্যাবেলের স্তম্ভগুলি বদলে হয় সেতু

মাকড়সা—মোহান্ত
এক সূত্রে সমস্ত প্রেমিকরা বাঁধা
আরও সব সূক্ষ্ম বন্ধন
আলোর সাদা রেখা
সূতো ও সমতা

হে অনুভব হে প্রিয় অনুভব
স্মৃতির শত্রু
বাসনার শত্রু
অনুতাপের শত্রু
অশ্রুর শত্রু
আমার সমস্ত প্রিয় জিনিসের শত্রুরা
আমি শুধু তোমাদেরই গৌরব দিতে লিখে যাই

[আপোলীনেয়ার কবিতায় সাধারণতঃ কমা, ফুলস্টপ ব্যবহার করতেন না। প্রথম কবিতার মূল নাম লাতিনে, Vitam Impendere Amori, তাঁর দ্বিতীয় গান, অনূদিত হল, পর পর লাইনে মিল ছিল, অনুবাদের সময় আমার হাতে অন্যরকম মিল এসে গেছে। এ কবিতা লেখার সময় কবির বয়স সবে তিরিশ পেরিয়েছে, মারি লরাঁসাঁ নামে শিল্পীর সঙ্গে ব্যর্থ প্রেমের পর, সেইজন্যই এ কবিতায় ঐরকম ছবির উল্লেখ। আপোলীনেয়ারও আলফ্রেড দে মুসের মতো এক নারী থেকে অন্য নারীতে ভালোবাসার পর্যটনে বিশ্বাস করতেন। দ্বিতীয় কবিতার নাম Liens, অমিল মুক্ত-ছন্দে লেখা, শেষ স্তবকের প্রথম লাইনটি আমি অনুবাদে ইচ্ছে করেই একেবারে স্তবকের শেষে বসিয়েছি।]

আন্টোনিন আর্তো

[আর্তোর কবিতা আজকাল অনেক সংকলনে থাকে না, কারণ আর্তো তাঁর প্রতিভা ছড়িয়ে দিয়েছিলেন বহু ধারায়, কবিতা, নাটক, নাটকে অভিনয়, পরিচালনা, ফিল্ম, চিত্রনাট্য লেখা, সমালোচনা ; বিশেষত অভিনয়। এ ছাড়া জীবনের অনেকগুলি মূল্যবান বছর কেটেছে পাগলা গারদে। কিন্তু আর্তোর প্রভাব এখন পৃথিবীর অনেক কবির রচনায়, বিশেষত আমেরিকার খুব প্রবল। এ ছাড়া আধুনিক নাটকে তাঁর চিন্তা বিশেষ সম্মানিত।

জন্ম ১৮৯৬, ভালো ছাত্র ছিলেন, কবিতা লেখা শুরু ১৪ বছর বয়সে, এর চার বছর পরেই মেলানকলিয়া রোগ, দু' বছর কাটে মেন্টাল হোমে, সেই থেকেই ধারাবাহিক অসুস্থতার শুরু।

সুররিয়ালিস্ট দলের এক সময় তিনি ছিলেন সবচেয়ে জীবন্ত, দুর্দান্ত, তীব্র বেপরোয়া সদস্য। এক সংখ্যা 'সুররিয়ালিজম বিপ্লবের' তিনিই সম্পাদক ছিলেন, কিন্তু শীঘ্রই বিচ্ছেদ হয়ে যায়, যখন ওঁরা সাম্যবাদ সমর্থন করেন। আর্তো মনে করতেন, এই নোংরা বাস্তব পৃথিবী নিয়ে মাথা ঘামানোই অশুচি, রাজনৈতিক ক্ষমতা বুর্জোয়া কিংবা সর্বহারাদের হাতে থাকলো—এতে তাঁর কিছু যায়-আসে না। এই বিচ্ছেদ এত উগ্র যে, পুরনো কাগজপত্র ঘাঁটলে দেখা যায়, আঁদ্রে ব্রেতোঁর দল ইস্তাহার ছাপিয়ে একান্তে ওর নাম কেটে দেন, এবং আর্তো ওঁদের বললেন ভণ্ড ও জোচ্চোর, তাঁর ব্যক্তিগত সুররিয়ালিজমের ধারণাই সৎ এবং খাঁটি, 'নতুন ম্যাজিক'।

বহু নাটকে অভিনয় করেছেন, নিজের শরীরে বহু মাদক পরীক্ষা করেছেন, সব সময় তাঁর মনে হত নিজের ভাবনার উপযোগী শব্দ পাচ্ছেন না, কে যেন তাঁর শব্দগুলি চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে, এই থেকে মাথার যন্ত্রণা শুরু হত। কারুর সঙ্গে ঠিক মানিয়ে চলতে পারতেন না, নিজের মতামত এমন দৃঢ়। বিষম আকর্ষণ ছিল প্রাচ্য দর্শনে। শেষবার শুভানুধ্যায়ী এবং বন্ধু-বান্ধবরা প্রায় জোর করেই পাগলা গারদে ভরে দেন, খুব আপত্তি ছিল, আর্তো ভেবেছিলেন এসব ষড়যন্ত্র, সেখান থেকে পেন্সিলে রক্ত-ঝরানো চিঠি লিখেছেন, যার প্রতিটি অনুবাদযোগ্য। সেখান থেকে ছাড়া পাবার দু'বছর পর ১৯৪৮-এ দুঃখিত মৃত্যু। Antonin Artaud-এ প্রথম নামের উচ্চারণ আমি শ্রুতিনির্ভর করে লিখেছি। এ নাম সম্ভবত ফরাসীদের হয় না, গ্রীক ; কারণ আর্তোর বাবা ফরাসী হলেও মা গ্রীক বংশের রমণী।]

একটি কবিতা

আমার সঙ্গে আছেন ঈশ্বর-কুকুর, আর তাঁর
ত্রিশূলের মতো জিভ বিদ্ধ করে আছে
যা তাকে সব সময় চুলকুনি দিয়েছে
পৃথিবীর দুই ভাঁজ গম্বুজের আস্তর।

এবং এখানে এক জলের ত্রিভুজ
ছারপোকার গতি নিয়ে হাঁটে
কিন্তু নিচে, ছারপোকাও বদলে যায় জ্বলন্ত কয়লায়
আর জল ছুরির মতন বিদ্ধ করে।

কুৎসিত বিশ্বের দুই স্তনের গভীরে
ঈশ্বর-কুকুরী লুকিয়েছে
পৃথিবীর বুক আর বরফের জল
পচন ধরায় সেই শূন্যগর্ভ জিভে।

আর এক কুমারীর এক হাতে হাতুড়ি
আসছেন পৃথিবীর গুহাগুলি ধ্বংস করে দিতে
সেখানে মাথার খুলি তারকা-কুকুরের
বোধ করে বীভৎস সমতার জেগে ওঠা।

[ইচ্ছে করেই ছন্দ-মিল দিয়ে সুখপাঠ্য করা হল না অনুবাদটি। কারণ আপাত-অর্থহীনতা ও রুক্ষ কর্কশ কবিতাটির সৌন্দর্য। যদিও মূল কবিতায় মিল আছে। দ্বিতীয় লাইনে বর্শা জাতীয় অস্ত্র ছিল, কিন্তু আমি পৃথিবী বিদ্ধ করার ইমেজের জন্য ত্রিশূল ব্যবহার করেছি। 'ঈশ্বর-কুকুর' অর্থে হয়তো ইজিপ্সীয় দেবতা আনুবিশ, সমাধিভবনের রক্ষক, তাঁর জিভ—চিন্তার গমনপথ, ত্রিভুজ—সংসার, শরীর ও আত্মা, ছারপোকার মতো রক্তশোষক—যে শুধু একরকম সৌন্দর্য দেখাতে পারে। ছুরি জিভ ইত্যাদি পুরুষত্ব-প্রতীক শব্দের সঙ্গে দ্বন্দ্ব লাগাবার জন্য কয়েকটি নারীত্ব-প্রতীক শব্দ আছে। পুরো কবিতাটিই এক হিসেবে চিন্তা ও লিখিত শব্দের দ্বন্দ্বের কথা। কবি আর্তো অর্ধেক ঈশ্বর ও অর্ধেক জানোয়ার—এই পৃথিবীর ধ্বংসস্তূপে একা বসে দেখছেন স্থূল, অকিঞ্চিৎকর বাস্তবের জেগে ওঠা।]

পল ভালেরি

[যদিও আপোলীনেয়ার দিয়ে এই পর্যায়ের অনুবাদ শুরু কিন্তু ক্লোদেল ও ভালেরিকে অন্তর্ভুক্ত না করলে ফরাসী কবিতার কোনো আলোচনাই হয় না। ভালেরি এই শতাব্দীর গভীরতম কবি। তাঁর নিজের নির্বাচিত কবিতাগুচ্ছ যদিও একটি ছোট সংকলনে এঁটে যায়, কিন্তু পৃথিবীর কবিতায় তাঁর স্থান চিরকালের। জন্ম ১৮৭১-এ, মুগ্ধ হয়েছিলেন এডগার এলান পো-র কবিতায় (তাঁর নিজের রচনা যদিও সম্পূর্ণ বিপরীত চরিত্রের)। মালার্মের বাড়ির সন্ধ্যেবেলার সাহিত্য-আড্ডায় যেতেন যুবক ভালেরি, তারপর কি কারণে যেন বহুদিন কবিতা লেখা ছেড়ে দিয়েছিলেন, ফিরে এলেন বহু বছর পর, এবং তখন থেকে প্রতিটি কবিতা অসাধারণ। কবিতার ইতিহাসে, এমন ত্যাগ করে আবার বহু পরে সার্থকতর হয়ে ফিরে আসার উদাহরণ আর দ্বিতীয় নেই। অঙ্ক ও বিজ্ঞান চর্চায় ছিল তাঁর আত্মার আনন্দ। ছিলেন সমালোচক, প্রাবন্ধিক, শিক্ষক আকাডেমির সদস্য, প্যারিসে রবীন্দ্রনাথের আঁকা ছবির প্রদর্শনীর ব্যবস্থা তিনিই করেছিলেন। মৃত্যু ১৯৪৫।

ভালেরির নাম যতটা পরিচিত, তাঁর কবিতা তত পঠিত নয় ফরাসী না-জানা মানুষের। অনুবাদের সম্পূর্ণ বাইরে তাঁর কবিতা। ইংরেজীতেও সার্থক অনুবাদ নেই। বাংলাতেও অনুবাদ খুব কম। 'সমুদ্রের পাশে কবর' নামে তাঁর অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য ও কঠিন কবিতা, যেটির অর্থান্তর নিয়ে সময় কাটানো বহু গবেষক ও বিশেষ পাঠকদের ব্যসন, একটি অতি-ব্যক্তিগত কবিতা, সেটি অত্যন্ত নিষ্ঠা ও পরিশ্রমে অনুবাদ করেছেন অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত। ভালেরি বিশ্বাস করতেন,

কবিতা লেখা কোনো সৃষ্টি বা প্রেরণার ব্যাপার নয়, অঙ্কের মতো নির্মাণ ও নির্বাচন। বলা বাহুল্য, তাঁর কবিতা বহু জায়গায় তাঁর এই মতের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, এসে গেছে কবিত্বের আবেগ ও মর্মস্পর্শিতা। আমরা এখানে একটি কবিতার অনুবাদ করছি শুধু এইটুকুই দেখাবার জন্য যে, ভালেরির কবিতার কিভাবে তন্নতন্ন অর্থ করতে চান সমালোচকেরা।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়, ভালেরির শ্রেষ্ঠ কবিতা, 'লা যন্ পার্ক' অর্থাৎ 'তরুণী ভাগ্য', ৫১২ লাইনের একটি বিস্ময়কর রচনা, যেটি নিঃসন্দেহে এ শতাব্দীতে ফরাসী ভাষার সবচেয়ে দুর্বোধ্য এবং সফলতম কবিতা, এ পর্যন্ত বাংলায় পূর্ণ অনূদিত হয়নি। অবশ্যই কারুর এ-চেষ্টা করা উচিত। মূলতঃ সঙ্গীত প্রধান বাংলা কবিতায় ক্রমশই অতি সারল্যের যে প্রবণতা এখন দেখা যায়, যার ফলে অধিকাংশ কবিতাই যে অর্থহীন আবেগ-ফলাফল হিসেবে প্রতীয়মান হয়, এর পরিপূরক হিসেবে কিছু দৃঢ়বদ্ধ, কঠিন, চেতনাপ্রধান কবিতার আদর্শও উপস্থিত থাকা উচিত, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত যার শেষ চেষ্টা করেছেন। ভালেরির পাশে আদর্শ বা প্রতিপক্ষ হিসেবে ছিলেন বলেই আপোলীনেয়ারের সঙ্গীতময় কবিতা অত সার্থক হতে পেরেছে। আমাদের বাংলা কবিতার আদর্শ, রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে, সঙ্গীতময়তা, ফলে অতি সারল্য ক্রমশঃ আসা স্বাভাবিক।]

নিদ্রিতা

কি গোপন তার হৃদয়ে পোড়ায় আমার তরুণী সখা
ফুলের গন্ধ নেয় কি আত্মা মধুর মুখোশ পরে ?
কোন্ নিষ্ফল পুষ্টিতে তার অশিল্প উষ্ণতা
ঘুমন্ত এই রমণীর দ্যুতি আপনি সৃষ্টি করে ?

নিশ্বাস, চুপ, স্বপ্ন এবং অভেদ্য নীরবতা
হে শান্তি, তুমি অশ্রুর চেয়ে প্রবল প্রবল, তুমিই জয়ী
যখন বিশাল ঢেউ আর সেই ঘুমের গভীর পূর্ণ
অমন একটি শত্রুর বুকে আঁটে শলা-ষড়যন্ত্র।

হে নিদ্রাবতী, স্বর্ণশস্য ছায়া ও সমর্পণের
তোমার হিংস্র বিশ্রাম সাজে ওরকম উপহারে
হরিণী, অলস শরীর ছড়ানো আঙ্গুরথোকার পাশে

যদিও তোমার আত্মা এখন সুদূরে, ব্যস্ত নরকে
তোমার অঙ্গ, পবিত্রতম তলপেট, ঢাকা একটি তরল হাতে
জেগে আছে ; জাগে তোমার অঙ্গ, আমার দু' চোখ খোলা।

[ঘুমন্ত নারী বহু কবিতা ও ছবির বিষয়। ভালেরির এই চতুর্দশপদী নিছক বর্ণনামূলক নয়, আবার কোনো রূপকও না। এটি প্রেমের কবিতা নয়, প্রেমের কবিতা ভালেরি প্রায় কখনও লেখেনইনি

বলা যায়। আসলে একটি যুবতী সত্যিকারের নিদ্রিতা কিন্তু তার শরীর জেগে আছে। এই নারীর শরীর ও আত্মাকে পৃথক করে, শরীর যা দ্রষ্টার চোখে সুন্দর ও রমণীয়, আর আত্মা যখন বিশ্লিষ্ট তখন রক্তমাংসের মিলনে উন্মুখ, কিছুটা অসৎ সেই ইচ্ছা—এই বৈপরীত্যের খেলায় জীবন ও মৃত্যু এসে যায়। শেষ পর্যন্ত কবির চোখে এই বাস্তব নারীর দেহ নগ্ন, একটি নরম হাত উরুদেশ ঢেকে আছে, তার আত্মা অন্যত্র, সুতরাং কু-বাসনায়, কিন্তু তার ঘুমন্ত অঙ্গ দেখতে পাচ্ছে ভাবী উপভোক্তাকে অর্থাৎ কবিকে।

অবশ্য অন্যরকম অর্থও করা যায়। ভালেরির নিজস্ব নির্দেশ আমরা অগ্রাহ্য করতেও পারি। পূর্বের উল্লেখ করা, 'লা যন্ পার্ক' কবিতা সম্পর্কে ভালেরি বলেছিলেন, পাঠকরা ইচ্ছে করলে এটাকে শারীরতত্ত্ব সম্পর্কে বক্তৃতা হিসেবেও গ্রহণ করতে পারেন। আর এই কবিতাটি, ভালেরির মতে, নিছক কবিতার আঙ্গিক ও শব্দ নির্বাচনের পরীক্ষা।

এখন এ কবিতার অনুবাদ অসম্ভব ? বস্তুত, মূল কবিতার এই অনুবাদের দুরবস্থা দেখে আমারই কষ্ট হচ্ছে। সংস্কৃতের মতো লঘু, গুরু, প্লুতস্বরের ব্যবহারের বিশিষ্টতায় ভালেরি অসীম উদ্যমী। পণ্ডিতরা বলেন মূল কবিতায় ma, amie, ame ইত্যাদি শব্দের a অক্ষরের দীর্ঘ উচ্চারণ শায়িতা নারীর বিস্তৃত দেহের আভাস এনেছে। s-এর ঘন ঘন ব্যবহারে ঘুমন্তের নরম নিশ্বাস। আঙুরগুচ্ছের পাশে শুয়ে থাকা হরিণীর চিত্রে ভোগআশ্লেষ থেকে সৌন্দর্যের অনুভূতি এসেছে I-এর ব্যবহারে। সবচেয়ে মজার, শেষ লাইনে জেগে থাকার কথা দু'বার কেন লিখেছেন ? কারণ, জেগে থাকা অর্থাৎ veille-এ শব্দের v অক্ষরের যে গঠন, এই অক্ষরটি যে-রকম দেখতে, এর মধ্যের ত্রিকোণ শূন্যতা নগ্ন শরীরের ত্রিকোণের কথা মনে পড়ায়। ইংরিজি অনুবাদেও এ অনুভাব আসতে পারে না, কারণ awake আর বাংলায় জাগা ! 'জ' দেখলে এরকম সুন্দর ছবি মনে পড়া অসম্ভব, 'জ'-কে দেখতেই কি রকম জ্যাঠামশাইয়ের মতো !]

পল ক্লোদেল

[ক্লোদেলের লেখা কবিতাধর্মী নাটকগুলি পৃথিবীর যে-কোন ভাষায় শ্রেষ্ঠত্বের দাবি করতে পারে। কবি হিসাবেও তিনি অত্যন্ত বড়, ক্ষমতাবান, বিশুদ্ধ কবিতার বাহক, কিন্তু সব সময় শ্রদ্ধেয় নন। ক্যাথলিক ধর্ম গ্রহণের পর তিনি হয়ে উঠেছিলেন উগ্র ধার্মিক, ধর্ম তাকে বিনয় শেখায়নি, শেখায়নি পরধর্মসহিষ্ণুতা। যদিও তিনি বলতেন, ক্যাথলিক ধর্ম গ্রহণের প্রেরণা তিনি পেয়েছিলেন র‍্যাঁবোর কবিতা পড়ে—সেই দুর্দান্ত, বিবেকহীন, ঈশ্বরহীন, বিদ্রোহী বালক কবি র‍্যাঁবো।

জন্ম ১৮৬৮, দীর্ঘজীবনের অধিকারী হয়েছিলেন, উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী হিসেবে বহুদিন কাটিয়েছেন চীন দেশ ও দূরপ্রাচ্যের দেশগুলিতে, এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে কিছুদিন ছিলেন চীনে ফরাসী দেশের রাজ-প্রতিনিধি, সেই সময়কার উপলব্ধিপ্রসূত তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ 'আমার জানা প্রাচ্যদেশ'। মূলতঃ ধর্মবিশ্বাসের জন্যই, ভারতবর্ষ সম্পর্কে শ্রদ্ধার বদলে অশ্রদ্ধেয় উক্তিই তাঁর বেশী। ৮৭ বছর বেঁচে বিশাল চেহারায় তিনি ফরাসী সাহিত্যের বুক জুড়ে ছিলেন, মৃত্যু ১৯৫৫। এ শতাব্দীর ইওরোপের অধিকাংশ কবিই খ্রীস্টধর্মকে অবহেলা ও ঈশ্বরকে খুন করেছেন, আর পৃথিবীর সব দেশের কবিরা সৃষ্টি করেছেন প্রত্যেকের আলাদা ব্যক্তিগত ঈশ্বর, সেখানে পল ক্লোদেলের প্রচলিত ধর্মের গোঁড়ামি এবং ঈশ্বরের প্রতি সরল ও দ্বিধাহীন বন্দনাই বৈশিষ্ট্য। সত্যিকারের মহৎ কবিত্বের অধিকারী হিসেবে তিনি শ্রদ্ধা ও সম্মান পেয়েছেন প্রভূত, কিন্তু সকলের ভালবাসা পাননি।]

সারমর্ম

কবির মনে আছে ঈশ্বরের আশীর্বাদ, এবং কবি তাঁকে
কৃতজ্ঞতা জানাবার বন্দনায় কণ্ঠ তোলে। কারণ, তুমিই আমাকে
মূর্তিপূজা থেকে মুক্ত করেছো। বাস্তবের পবিত্রতা ও ঐশ্বর্য-কার্যকারিতার
চমকপ্রদ দৃশ্য দেখায় ; সবই প্রয়োজনীয়। কবি চায়, তাকে
ভৃত্যদের মধ্যে স্থান দেওয়া হোক। কারণ, তুমি আমাকে
মৃত্যু থেকে মুক্ত করেছো। নিষ্প্রাণ ও ঘাতক দর্শনের বীভৎসতা ও
অভিশাপময়তা (থেকে মুক্ত করেছো)। কবিত্বের দায়িত্ব সর্বভূতে
ঈশ্বর সন্ধান এবং তাদের প্রকাশ, যেন সব কিছুই ভালোবাসায়
মিশে যায়। বিরতি। সৃষ্টিজনিত ক্লান্তি। দৈব ইচ্ছা ও দৈব সমতার
কাছে অপাপ ও সরল আত্মসমর্পণ। পুণ্য আমার ঈশ্বর,
যিনি আমাকে আমার আমি থেকে মুক্ত করেছেন, এবং তুমি—
তুমিই স্বয়ংসম্পূর্ণ—আমার বাহুতে এই সদ্যোজাত শিশুর বেশে এসেছো।
ঈশ্বরকে বুকে করে, কবি প্রতিশ্রুত ভূমিতে প্রবেশ করে।

মিশ্রণ

এবং আবার আমি ফিরে এলাম উদাসীন তরল সমুদ্রে।
আমার মৃত্যুর পর আমাকে আর যন্ত্রণা সইতে হবে না।
পিতা ও মাতার মধ্যে কবরে যখন শুয়ে থাকবো, আমাকে
আর যন্ত্রণা সইতে হবে না।
এই অতিরিক্ত ভালোবাসাময় হৃদয় আর বিদ্ধ হবে না বিদ্রূপে।
শরীরের দীক্ষা আমার মিশে যাবে পৃথিবীর অভ্যন্তরে, কিন্তু আত্মা
তীব্রতম কান্নার মতো বিশ্রাম নেবে আব্রাহামের বুকে।
এখন সব কিছুই মেশা, বৃথাই আমি ভারী এক চক্ষে খুঁজি আমার
চারপাশের সেই চেনা দেশ, আমার পদক্ষেপের নিচে নিশ্চিত পথ
এবং সেই নিষ্ঠুর মুখ।
আকাশ কুয়াশা ছাড়া কিছুই না, শূন্যতা শুধু জল
দেখো, সবই এখন মিশ্রিত, তবু আমি চার পাশে খুঁজি রেখা ও আঙ্গিক।
দিগন্তের জন্যও কিছু নেই, শুধু গাঢ় অন্ধকার রঙের অবশেষ
সব দ্রব্য মিলিত হয়েছে এক জলে, যে জল আমি অনুভব করি
আমার চিবুকে গড়ানো অশ্রুর ধারায়
এর স্বর ঘুমের মতন, যখন নিশ্বাস নেয় আমাদের ভিতরের বধিরতম আশায়
এখন সন্ধান বৃথা, নিজের বাহিরে আমি কিছুই দেখি না
না আমার সেই দেশ, না আমার অতিপ্রিয় সেই মুখচ্ছবি।

[ক্লোদেলের অধিকাংশ কবিতাই গদ্যছন্দে, এবং এই গদ্যে আশ্চর্য ধ্বনিমাধুর্যের ব্যবহার। প্রথম রচনাটি সম্পূর্ণ কবিতা নয়। 'ম্যাগনিফিকাত' নামক দীর্ঘ কবিতার মুখবন্ধ। 'ম্যাগনিফিকাত' শব্দটি ধর্মীয়, বাইবেলে লুক লিখিত অংশে কুমারী মেরীর গান, যেখানে তিনি ঈশ্বরকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছেন তাঁর সৌভাগ্যের জন্য। ক্লোদেলের কবিতাটিও অনুরূপ বিষয়ে। এখানে তিনি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছেন—১৯০৭ সালে চীন দেশে তাঁর নিজের মেয়ে মেরীর জন্ম উপলক্ষে। এই খণ্ড কবিতাটির শেষে 'সদ্যোজাত শিশুর' প্রসঙ্গ এসেছে ঐ কারণেই। এই সঙ্গে কবি ধন্যবাদ জানাচ্ছেন ঈশ্বরকে, তাঁর নিজের ধর্মান্তরের জন্য, যে খ্রীস্ট সমগ্র মানবজাতিকে উদ্ধার করার জন্য জন্মেছিলেন, তিনি কবিকেও উদ্ধার করেছেন। দ্বিতীয় কবিতাটি, আমার জানা প্রাচ্যদেশ' গ্রন্থের শেষ রচনা ১৯০০—১৯০৫, এই সময়ে ক্লোদেলের ধর্মবিশ্বাস খানিকটা টলে উঠেছিল, একটা অবৈধ প্রেমের ব্যাপারে জড়িয়ে পড়েছিলেন—যার ফলে তাঁর ধর্ম, সম্মান, এমনকি চাকরি নিয়েও খানিকটা টানাটানি পড়ে। তিনি নিজেই পরে এই সময়কার বর্ণনা দিয়েছেন তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা 'পারতেজ দ্য মিডি' নাটকে। মূল কবিতার প্রতিটি শব্দই প্রায় কান্না-ভরা। সাময়িকভাবে চীন দেশ ছেড়ে যাওয়া ও ব্যর্থ প্রেম, এ দুটি বিষয় মনে রাখলে কবিতাটি বুঝতে অসুবিধে হয় না।]

সাঁ-ঝাঁ প্যার্স

[ব্রেতোঁ তাঁর সুররিয়ালিস্টদের নামের তালিকায় যদিও বলেছেন, 'সাঁ-ঝাঁ প্যার্স দূর থেকে সুররিয়ালিস্ট' কিন্তু প্যার্স-কে সুররিয়ালিস্ট বলা বড়ই কষ্ট কল্পনা। তাঁর জগৎ সম্পূর্ণ পৃথক। জন্ম তাঁর ফরাসী দেশ থেকে এক দূরতর দ্বীপে, অভিজাত পরিবারে, ১৮৮৭। আসল নাম আলেক্সি লেজে। ফরাসী ভাষার এরকম একজন সার্থকতম কবি, দীর্ঘ সময়ই কেটেছে ফরাসী দেশের বাইরে। ১৯৪০-এর আগে প্রকাশিত হয়েছিল মাত্র দুটি চটি বই, বন্ধুবান্ধব ও কিছু ঘনিষ্ঠ পাঠকের বাইরে, তাঁর নাম ছিল অপরিচিত। ১৯১৪-তে কূটনৈতিক দপ্তরে চাকরি নিয়ে ক্লোদেলের মতো বহুদিন কাটান চীন ও প্রাচ্যের অন্যান্য দেশে। তারপর ফরাসী সরকারের বৈদেশিক দপ্তরে স্থায়ী সেক্রেটারী হয়েছিলেন। নাৎসীবাদের প্রবল বিদ্বেষী প্যার্স, ১৯৪০-এ জার্মানীর ফরাসী দেশ অধিকার ও ক্রীড়নক ভিসি-সরকার গঠনে অত্যাচারের ভয়ে ও কিছু সংখ্যক দেশবাসীর বিশ্বাসঘাতকতার গ্লানিতে ভগ্নহৃদয়ে দেশ ত্যাগ করে চলে এলেন আমেরিকার ওয়াশিংটনে। সেই যে গেলেন, আর ফিরলেন না। ওভিডের সময় থেকে শুরু হয়েছে যে নির্বাসিত লেখকের দল, প্যার্সও তাদের একজন। এরপর নিউইয়র্ক থেকে তাঁর পর পর কবিতার বইগুলি দ্বি-ভাষা সংস্করণে প্রকাশিত হতে থাকে, তাঁকে পৌঁছে দেয় খ্যাতির উচ্চ শিখরে। ১৯৬০-এ নোবেল প্রাইজ। আমেরিকার রাজধানী ওয়াশিংটনের চাপা, গুমোট বিশ্রী আবহাওয়ার মধ্যে রইলেন তিনি স্বেচ্ছা নির্বাসনে। প্যার্সের দৃঢ়শৈলী গদ্য র‍্যাঁবো, মালার্মে, ক্লোদেলের ধারার সার্থকতার পরিণতি। ঈশ্বর, দৈবশক্তি, প্রকৃতি, পবিত্র কুমারীর প্রতি স্তোত্র, বন্দনা, সাম গানের যে রীতি উজ্জীবিত করেছিলেন ক্লোদেল, প্যার্সও সেই রীতি ব্যবহার করেছেন। কিন্তু প্যার্সের প্রকৃতির মধ্যে কোথাও ঈশ্বর বা দৈবশক্তির উল্লেখ নেই, তাঁর চোখে দেখা জগতের তিনিই স্রষ্টা, প্রকৃতির উদ্ভাসন তাঁর বর্ণনায় পৃথক সৃষ্টি হয়ে উঠেছে। তাঁর গ্রন্থগুলির নামও এইরকম সহজ, 'বৃষ্টি' (১৯৪৩), 'তুষার' (১৯৪৪), 'বায়ু' (১৯৪৬) ইত্যাদি।

সুররিয়ালিস্টদের বিপরীত, চলিত শব্দ বা মুখের ভাষা তাঁর কবিতায় প্রায় নেই। তাঁর কবিতা ক্বচিৎ ব্যক্তিগত]

প্রশস্তি—২

আমার মায়ের দাসীরা, দীর্ঘ, মসৃণ রমণী…এবং আমাদের
উপকথাময় চক্ষুপল্লব…হে
উজ্জ্বলতা ! হে করুণা !
প্রত্যেক বস্তুকে আহ্বান করে আমি উচ্চারণ করি সে মহৎ,
প্রত্যেক জন্তুকে বলি সুন্দর এবং দয়াময় ।
হে আমার দীর্ঘতম
সর্বভুক ফুলগুলি, রক্তিম পাপড়িদলে আমার সুন্দরতম
সবুজ পতঙ্গদের গ্রাস করতে উৎসুক ! বাগানে ফুলের গুচ্ছে
পারিবারিক সমাধির গন্ধ ! কনিষ্ঠা বোনটির মৃত্যু হয়েছে :
তিন ঘরের আয়নাগুলির মধ্যে
গন্ধ সমেত তার মেহগনি শবাধার আমার সঙ্গে ছিল ।
পাথর ছুঁড়ে টুনটুনি পাখিদের মারা উচিত নয়…
তবু পৃথিবীর গুঁড়ি মেরে বসে আমাদের খেলার মধ্যে, দাসীর
মতন, যদিও দাসীর অধিকার আছে, পরিবারের সকলে অন্তঃ-
পুরে রইলে, চেয়ারে বসার ।

বৃষ্টি—৮

……বর্ষণের বটবৃক্ষ নগরে ছড়ায় তার বিচারের সভা । স্বর্গের
হাওয়ার প্রতি এই সেই ভ্রাম্যমাণ এরকম
আমাদের মধ্যে বসবাসে আগমন ! …তুমি অস্বীকার করো না ;
যারা অকস্মাৎ শূন্য হয়ে আসে আমাদের জন্য……
যাঁরা জানতে উৎসুক বৃষ্টি পৃথিবীতে এসে শোভাযাত্রা করে
গেলে কি ঘটনা হয়, তাঁরা এসে বাস করুন আমার বাড়ির
ছাদে, চিহ্ন, সঙ্কেতের মধ্যে । অরক্ষিত শপথ ! অনলস
বপন মানুষের সৃষ্ট পথের উপরে
ধোঁয়া !
আসুক বিদ্যুৎ, হাঃ ! কে আমাদের ত্যাগ করে !……নগরের
দ্বারে দ্বারে আমরা ফের নীত হবো
এপ্রিলের নিচে দীর্ঘকায় বৃষ্টি হেঁটে যায়, চাবুকের নিচে
দীর্ঘকায় বৃষ্টি ছোটে, যেন নিজ পৃষ্ঠে বেত্রাঘাত অনুষ্ঠান ।

[প্রথম কবিতার দাসী, সম্ভবতঃ হিন্দু রমণী । আফ্রিকা থেকে ক্রীতদাস চালান গত শতাব্দীতে বন্ধ

হয়ে গেলেও এশিয়া থেকে গোপনে দাস-দাসী রপ্তানি অব্যাহত ছিল। প্যার্সের পৈত্রিক দ্বীপভবনে এইরকম কয়েকজন দাস-দাসী ছিল ; কোনো কোনো ভাষ্যকার এ কবিতায় যে দাসীর উল্লেখ, তাকে হিন্দুই বলেছেন। ভারতীয়দের লৌহবর্ণ শরীর ফরাসীদের চোখে বড় প্রিয়, কক্তো'র কবিতায় এর চমৎকার উল্লেখ আছে। এ কবিতার দাসী পৃথিবীর উপমেয়।

প্যার্সের কবিতা সম্পর্কে একটি খুব সুন্দর তুলনা আছে। নিজের কবিতায় ব্যক্তিগতভাবে তিনি বিষমভাবে অনুপস্থিত। এ যেন কোনো মন্দিরের পুরোহিত দেবতাকে পূজা করছেন, পাশেই নানা সুন্দর, মহার্ঘ দ্রব্য পূজার অর্ঘ্য হিসেবে সাজানো। পুরোহিত সবই উৎসর্গ করছেন দেবতাকে, নিজেকে কিছুই না। প্যার্স ও তাঁর কবিতার ও প্রকৃতির সমস্ত সুন্দর উপাদান উৎসর্গ করছেন মানুষকে বা অদেখা পাঠককে। নিজের জন্য কিছু রাখলেন না। 'বৃষ্টি' কবিতার 'তুমি' সেই পাঠক।

'বৃষ্টি—৮' একটি দীর্ঘ কবিতার অংশ। প্যার্স একবার কৌতুক করে নিজের কবিতা সম্পর্কে বলেছিলেন, 'আমার সমস্ত কবিতা আসলে একটি মাত্র দীর্ঘ বাক্য, বিরতীহীন এবং চিরকালের জন্য দুর্বোধ্য।' সেই হিসেবে তাঁর যে-কোনো কবিতাই অংশ-কবিতা। এই কবিতা বৃষ্টির বর্ণনা, ঠিক আবার বৃষ্টিও না বোধ হয়। যুদ্ধের সময়ে নির্বাসিত কবির হতাশা ও তিক্ততা, পরিপার্শ্বের মানুষ তাঁকে ভুল বুঝছে, কবি দূর থেকে দেখছেন ইওরোপের ধ্বংস ও পরিবর্তন, এখানে বৃষ্টির অন্য ভূমিকা আছে। কয়েকটি শব্দের আলোচনা করলেই তা বোঝা যাবে।

'বটবৃক্ষ' আমার রূপান্তর নয়, মূল কবিতায় ব্যবহৃত। যে বটগাছ নানান্ শিকড় ছড়ায়। 'বিচারের সভা' কথাটি বিভ্রান্তি ঘটাতে পারে। মূল শব্দের ব্যবহার পরিমিত অর্থে। assise, ইংরেজি assizes—ইংলন্ডের ছোট ছোট শহরে নানান্ অপরাধের মধ্যযুগীয় বিচার অনুষ্ঠান। কদাচার ও পাপে পূর্ণ পৃথিবীর উপর শেষ বিচারের ঘোষণার ইঙ্গিত আছে এখানে।

শেষ লাইনের বেত্রাঘাত অনুষ্ঠানের মূল শব্দ Flagellants-এর তুলনীয় শব্দ বাংলায় নেই। অর্ডার অব ফ্লাজেলান্টস—মধ্যযুগের একরকম ধর্মীয় আচার। আত্মশুদ্ধির জন্য সাধক নিজের পিঠে নিজেই বেত মারতেন, অথবা লোক ভাড়া করতেন নিজের পিঠে চাবুক খাবার জন্য।]

ব্লেইজ স্যাঁদরার

[আপোলীনেয়ার থেকে যে আধুনিকতার শুরু ফরাসী সাহিত্যে, তার থেকে বিচ্ছিন্ন কিন্তু সমসাময়িক আর তিনজন প্রবল শক্তিমান ছিলেন। ভালেরি, ক্লোদেল এবং পেগি। শেষোক্তজন, অর্থাৎ শার্ল পেগির কবিতা আর আমরা এখানে অনুবাদ করলুম না। কারণ, পেগির কাব্যমূল্য এখনকার চোখে কিছুটা নিষ্প্রভ, তিনিও ছিলেন ক্লোদেলের মতো ক্যাথলিক, এবং মূলতঃ ফরাসী দেশাত্মবোধের জনপ্রিয় কবি, সুতরাং এখন আমাদের কাছে উপভোগের আকর্ষণ কম।

আপোলীনেয়ারের বন্ধুবান্ধব, সমসাময়িক কবি এবং যাঁদের মধ্যে সুররিয়ালিজমের অঙ্কুর প্রথম উঁকি মারে, তাঁদের মধ্য থেকে আমি ব্লেইজ স্যাঁদরারকে বেছে নিলাম। এই দলের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য কবি আলফ্রেড জারি, মাক্স জাকব এবং লেয়ঁ-পল ফার্গ। জারির কবিতার চেয়ে নাটক বেশী সার্থক, বিশেষত তাঁর 'উবু রাজা' এই শতাব্দীর সত্যিকারের প্রথম উদ্ভট, আজগুবী, বিদ্রূপ-ঝক্ঝকে নাটক যা পরবর্তীকালের আধুনিক নাট্যকারদের প্রভূত প্রভাবিত করেছে। যদিও নাটকটি এই শতাব্দী শুরু হবার কিছু আগে লেখা। রবীন্দ্রনাথের হিং টিং ছটের হবুচন্দ্র রাজার সঙ্গে 'উবু রাজা'র খুব মিল আছে। মাক্স জাকব এবং লেয়ঁ-পল ফার্গের কবিতায় যে দানা ছিল তারই সবিস্তার রূপবান প্রকাশ আছে আপোলীনেয়ারের কবিতায়, ফলে পরবর্তী যুগে ওঁরা কিছুটা ম্লান হয়ে গেছেন। এখন ওঁরা টিকে আছেন সংকলন-গ্রন্থে। বাংলায় মাক্স জাকবের কবিতার অনুবাদ করেছেন কবিতা সিংহ ও উৎপলকুমার বসু। ব্লেইজ স্যাঁদরার বাংলায় কিছুটা অপরিচিত

কিন্তু ফরাসী কবিতার ইতিহাসে ওঁর অবদান মূল্যবান।

জন্ম ১৮৮৭, প্যারিসে, খাঁটি ফরাসী নন্। বহু দেশ ঘুরেছেন, বহু রকম কাজ করেছেন, এমন কি মণি-মুক্তোর সেল্সম্যানগিরি পর্যন্ত। ভ্রমণ-কবিতাগুলোই তাঁর শ্রেষ্ঠ। প্রথম মহাযুদ্ধে ডান হাতটা কাটা যায়, বাঁ হাত দিয়ে টাইপ করে করে লিখতেন। বহু অনুবাদের কাজ করেছেন। নিগ্রোদের শিল্প ও সংস্কৃতি সম্পর্কে খুব ঝোঁক ছিল। মৃত্যু ১৯৬১-তে।]

সূর্যাস্ত

সকলেরই মুখে সূর্যাস্তের কথা
পৃথিবীর এ অঞ্চলে সব পর্যটকরাই সূর্যাস্ত বিষয়ে
কথা বলতে একমত
এমন অসংখ্য বই আছে, যাতে শুধু সূর্যাস্তেরই বর্ণনা
গ্রীষ্মমণ্ডলের সূর্যাস্ত
হ্যাঁ, সত্যিই, ভারী চমৎকার
কিন্তু আমি বেশী ভালোবাসি সূর্যোদয়
ভোর
আমি একটি প্রত্যুষও হারাই না
আমি ডেকের উপর দাঁড়িয়ে থাকি
নগ্ন
আমি একা সূর্যোদয়ের বন্দনা করি
কিন্তু আমি সূর্যোদয়ের বর্ণনা করিতে চাই না
আমি আমার ভোরগুলি নিজের জন্যই রেখে দেবো।

জ্যোৎস্না

নাচি আমরা ট্যাঙ্গো নাচি জাহাজে
চাঁদ এঁকেছে চাঁদের বৃত্ত জলে
আর আকাশে বৃত্ত আঁকে মাস্তুল
আঙুল তুলে দেখায় দূরে তারার দঙ্গল

রেলিং ধরে ঝুঁকে রয়েছে নবীনা এক আর্জেন্টিন-বালা
ফরাসী উপকূলের আলো মালার দিকে তাকিয়ে এখন
স্বপ্ন দেখে প্যারিসের
অল্প চেনা প্যারিস তার অনুতাপের প্যারিস
জাহাজ থেকে ঘুরছে আলো দু'রঙা আলো, আলো এবং গ্রহণ

মনে পড়ায় বড় রাস্তায় হোটেল ঘরের জানলা থেকে দেখা
ওরা সবাই ফিরে আসবে শপথ করেছিল
ঐ যুবতী স্বপ্ন দেখছে আবার দ্রুত ফিরে আসবে প্যারিসে
থেকে যাবে
আমার টাইপ রাইটারের শব্দ ওঠে শব্দ ওকে স্বপ্ন শেষ করতে
দেয় না
আমার এই চমৎকার টাইপ রাইটার প্রতি লাইনের শেষে কেমন
টুং শব্দে বেজে ওঠে
আর কেমন দ্রুত ছোটে যেমন ঠিক জ্যাজ সঙ্গীত
আমার এই চমৎকার টাইপ রাইটার আমায় কোনো স্বপ্ন
দেখতে সুযোগ দেয় না
না ওদিকের বন্দরের না বিপরীত জাহাজ মুখের
অনুসরণে বাধ্য করে শেষ অবধি এক চিন্তার
আমার চিন্তা

[অধিকাংশ পথিকৃৎকেই শেষ পর্যন্ত যে দুর্ভাগ্য সইতে হয়, স্যাঁদরারকেও তা সইতে হয়েছে। অর্থাৎ তাঁর কবিতায় যা কিছু নতুন এবং মৌলিক, যেমন কবিতায় গদ্যধর্ম, যতিচিহ্নহীন চেতনাপ্রবাহ, ফটোগ্রাফের মতো বর্ণনা (সেটা ছিল চলচ্চিত্রের আদি যুগ, সুতরাং কবিতা চলচ্চিত্রকে বা চলচ্চিত্র কবিতাকে খুব অভিভূত করেছিল)—এই সমস্ত রীতি পরবর্তী বহু কবি এবং অনেক বেশী শক্তিমান কবিরা আরও এমন সার্থকভাবে ব্যবহার করেছেন যে, প্রথম ব্যবহারকের কথা আর আমাদের মনে থাকে না বা পড়তে ক্লান্তিকর লাগে। কিন্তু এঁদের থেকেই শুরু হয়েছিল এই নতুন ধারা, কবিতাকে অতিশয় ব্যক্তিগত করে তোলা, বর্ণিত বিষয়ের মধ্যে কবি নিজে সব সময় উপস্থিত, বা কোনো দৃশ্যের মধ্য দিয়ে যেতে যেতে তাৎক্ষণিক মানসিক প্রতিফলন, পারম্পর্যহীন হলেও সঙ্গে সঙ্গে লিখে রাখা। এসব আমাদের বাংলা কবিতাতেও এত ব্যবহৃত হয়েছে যে, এখন আর এ রকমের কবিতা নতুন মনে হবার সুযোগ নেই, তা ছাড়া স্যাঁদরারের কবিত্ব খুব বেশী কালোত্তীর্ণ হবার মতো গর্ভবতী নয়। সুতরাং, এ কবিতা পড়ার সময় ৪০/৪৫ বছর আগের ইতিহাস মনে রাখা দরকার।

অনুবাদের আরেকটি অসুবিধে এবার বোধ করলুম। আমরা মুখের কথায়, লেখায় অনেক ইংরেজী শব্দ ব্যবহার করি, কিন্তু কবিতা অনুবাদের সময় প্রতিটি শব্দই বাংলা করার দিকে আমাদের ঝোঁক। কিন্তু অনেক শব্দের যে বাংলাই নেই। (যেমন অনেক বাংলা শব্দের ইংরেজী হয় না।) দ্বিতীয় কবিতার মূল শেষ লাইন, 'মনিদে'-এর বাংলা 'আমার চিন্তা' একেবারে ভালো শোনায় না। 'আইডিয়া' শব্দের বাংলা কি ? ভাবনা বা চিন্তা ঠিক নয়, এ দুটোর মধ্যে যেন একটু দুঃ মেশানো আছে। আবার 'ভাব'ও চলে না—ওটা যেন বেশি গদগদ। 'আমার একটা আইডিয়া মনে এসেছে'—এর বদলে 'আমার মনে একটা ভাব এসেছে' একেবারে অসম্ভব। আইডিয়ার এক কথায় বাংলা, অভিধানে দেখলুম, চিচ্ছবি। কিন্তু এ শব্দটা চলবে কি ? নাঃ !]

পীয়ের রেভার্দি

[১৯৫০-এর পর ফরাসী দেশের তরুণ লেখকরা যখন নিউ নভেল আন্দোলন শুরু করে, তখন কবিতাতেও তারা প্রতিষ্ঠিত প্রবীণ কবিদেরও উপস্থিত করে নিজস্ব বিচারালয়ে। কাকে কাকে রাখা হবে দলনেতা হিসেবে, কে কে গণ্য হবেন সার্থক পূর্বসূরী হিসেবে, কোন্ কোন্ কবির ওপর পড়বে বিস্মৃতি ও ঔদাসীন্যের খড়্গাঘাত, কার রচনায় তরুণদের সত্যিকারের আনন্দ। অধিকাংশ প্রবীণ সুররিয়ালিস্ট কবি তখন প্রাক্তন গুরু হিসেবে গণ্য, আবার ঈষৎ বিস্মৃত কয়েকজন কবির নামও প্রবলভাবে ফিরে এলো নবীন লেখকদের কাছে। এই সময় আবার উচ্চকিত হয়ে উঠলো পীয়ের রেভার্দির নাম, তরুণরা তাঁর কবিতার সঙ্গে বিশেষ আত্মীয়তা বোধ করলো, অথচ রেভার্দি তখন নির্জন মঠে স্বেচ্ছানির্বাসনে।

পীয়ের রেভার্দির জন্ম ১৮৮৯-এ দক্ষিণ ফ্রান্সের এক সাধারণ পরিবারে। একুশ বছর বয়েসে প্যারিসে এলেন খবরের কাগজে প্রুফ রিডারের চাকরি নিয়ে। এই সময় প্যারিসে আলফ্রেড জারি, মাক্স জাকব, আপোলীনেয়ার এবং কিউবিস্ট শিল্পীরা সাহিত্য, শিল্প, থিয়েটার নিয়ে প্রবল উন্মাদনায় মেতে আছেন। রেভার্দি সহজেই আবিষ্কার করলেন ওঁদের স্বজাতী হিসেবে। তিনি ওঁদের দলে মিশে গেলেন। কিন্তু কয়েক বছর পরই আরম্ভ হল প্রথম মহাযুদ্ধ। আপোলীনেয়ারের সঙ্গে তিনিও যুদ্ধে যোগ দিলেন। দুজনেই ফিরে এলেন ১৯১৭ সালে, আপোলীনেয়ার মাথায় গোলার আঘাত নিয়ে, রেভার্দি স্বাস্থ্যের কারণে। ঐ বছরেই বন্ধুদের সঙ্গে প্রতিষ্ঠা করলেন বিখ্যাত সাহিত্য পত্রিকা 'নর-সুদ' অর্থাৎ 'উত্তর দক্ষিণ'। এই পত্রিকা প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত করে ডাডাইস্ট ও সুররিয়ালিস্টদের। আপোলীনেয়ারের হঠাৎ মৃত্যু হওয়ায় রেভার্দি, জাকব, স্যাঁদরার এঁরাই হলেন সুররিয়ালিস্টদের প্রধান অবলম্বন, প্রতিষ্ঠিত সমর্থক।

কিন্তু হঠাৎ চরিত্র বদলে গেল রেভার্দির। বিপ্লবীর ভূমিকা ছেড়ে অকস্মাৎ১৯২৬-এ তিনি ক্যাথলিক ধর্ম গ্রহণ করলেন, অন্তরীণ হলেন এক খ্রীস্টান মঠে, সেখানেই নির্জন হয়ে রইলেন বাকি জীবন। দীর্ঘ জীবন, ১৯৬০-এ মৃত্যুর আগে আর একবারও বিচলিত হননি।]

ভগ্নহৃদয়

আ-আজ সব চলেছে শেষের দিকে
দেয়ালে ছড়ায় ঢিমে-লয় সঙ্গীত
মুখে এক হাত
অপর হাতের ছোঁয়ার উল্টো পিঠটুকু নেই
জানলা গলিয়ে পালায় নগ্ন প্রেম
মনোরম ছবি
একটি রমণী পরেছে ছিন্ন সেমিজ
বেশ তো ভঙ্গি এ মহৎ কামনার
কেঁদে কেঁদে সেই রমণীটি যায় আকাশের দিকে
যে আকাশ তাকে ডাকে
জল ও কঠিন বৃক্ষের দল
বেহালার সুর ছাড়া প্রণয়ের নিরাশা
যাই হোক তবু ফাঁদ পাতা আছে গোপন

চৌরাস্তায় ভারী অগ্যানি একটি গ্রীষ্ম সন্ধ্যা
তোমার বিষাদ করেছে অর্থময়
হালকা দুঃখ
কিছুই থাকে না
বন্ধুরা সব মৃত
স্ত্রীলোকেরা তবু নিজের গরজে তাদের দেখতে যায়
তুমি এসেছো এ খেলায় একটি অশুভ চিহ্ন নিয়ে
কি তোমার সাধ ভদ্র মানুষ অথবা দস্যু হওয়া
কোনো কিছু নয়
আমার চামড়া লুকিয়ে রেখেছি পোশাকের নিচে ভাঁজে
স্রোত বয়ে যায় যে স্রোত বয়েই যাবে
আমার হাসিও মিশিয়েছি তার সঙ্গে
ছাদের ওপর দাঁড়িয়ে তোমার যুক্তির দিকে দেখি
পৃথিবী কি খুশী হাসছে পৃথিবী তোমারও হাস্য
এক রাত্তিরে আমি হারালাম আমার বয়েস শৈশব নাম

[যদিও সুররিয়ালিস্ট দলের সমর্থক ছিলেন, মেতে উঠেছিলেন নতুন রীতির আন্দোলনে, কিন্তু রেভার্দির কবিতার চরিত্র অন্যরকম, তাঁর সমসাময়িকদের সুরের সঙ্গে মেলে না। সুররিয়ালিস্টদের মতে, এই বাস্তব জীবনটাই আসলে বাজে, কোনো মানে হয় না, অবাস্তর, বরং স্বপ্নের জীবন ও মগ্ন চৈতন্যই সত্য, অতি বাস্তব। সুতরাং শিল্প সৃষ্টির উদ্দেশ্য এ জীবন-যাপন বদলে দেওয়া। রেভার্দি নিজের কবিতায় এ মত মানেননি, বরং বিপরীত। তাঁর মতে, কবিতার কাজ হল, যে জীবন তাঁকে দেওয়া হয়েছে তাতেই চূড়ান্তভাবে বেঁচে থাকা, স্বপ্ন ও বাস্তব যে সূক্ষ্ম সীমায় এসে মিশেছে সেখানে দাঁড়ানো, অপসৃয়মাণ মুহূর্তগুলিকে ধরে রাখা, যেখানে বাস্তব কখনো কখনো হয়ে ওঠে পরম সত্য। এই নির্দিষ্ট বাস্তব জীবনকে চূড়ান্তভাবে বাঁচার ধারণাই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরের কবিদের নতুন করে প্রেরণা দিয়েছে।

রেভার্দি তাঁর কবিতায় কখনো কখনো কমা ফুলস্টপ দিতেন, কখনো দিতেন না। 'ভগ্নহৃদয়' কবিতাটিতে নেই। অনুবাদ করার সময় আমি যোগ করে দেব কিনা ভাবনায় পড়েছিলাম। তাঁর ইমেজগুলো টুকরো টুকরো, লাইনগুলি যোগাযোগহীন। কবিতায় আমরা যে-রকম মানে খুঁজতে চাই, সে-রকম অর্থ প্রতি লাইনে নেই। কিন্তু সমগ্র কবিতা উজ্জ্বল অর্থময়। যেন, একটি নামহীন মানুষ, একটি উদ্বিগ্ন আত্মা এই টুকরো ছবিগুলোর মধ্য দিয়ে দেখছে পৃথিবীকে। মাঝে মাঝে এক একটা লাইন হঠাৎ উচ্চাকাঙ্ক্ষী মনে হয়, যেন কবি কোন বিরাট রহস্য উন্মোচন করতে চলেছেন। কিন্তু সে রহস্য আর ধরা পড়ে না, কবির চোখ আটকে দেয় এক অদৃশ্য পর্দা, আবার কবিকে ছোট ছোট দৃশ্যের মধ্যে খুঁজতে হয়। রেভার্দির সমগ্র কবিতায় বিধৃত হয়েছে মানুষের ভাগ্যের দুঃখ। এই রকম তাৎক্ষণিক অনুভূতির ছোট ছোট ছবিতে গেঁথে তোলা কবিতার নাম রেভার্দি দিয়েছিলেন 'পোয়েজি ব্রুত'—অর্থাৎ কর্কশ কবিতা।

এই কবিতায় 'আমি' আর 'তুমি' হয়তো একই ব্যক্তি। শার্ল পেগির কবিতায় যেমন ঈশ্বর এসে পেগির ভাষায় কথা বলতেন, তেমনি রেভার্দিও অনেক সময় নিজেকেই নিজের ভাষায় শাসন করেছেন।]

জাঁ কক্‌তো

[প্যারিসের যতগুলি সৌধ, স্তম্ভ, মিনার, শিল্পকীর্তি আছে, মৃত্যুর আগে পর্যন্ত কক্‌তো-ও ছিলেন যেন তার অন্যতম। প্যারিস শহরের বিশেষ দ্রষ্টব্য। ফরাসী নাগরিক বিদগ্ধ পুরুষদের প্রতিমূর্তি। প্যারিসের অদূরে ধনাঢ্য পরিবারে জন্ম, ১৮৮৯। চরম শৌখিন এবং পরম বেপরোয়া জীবনযাপন করেছেন প্যারিসেই। বদলেয়ার এবং আপোলীনেয়ার যেমন অসংখ্য রচনায় প্রিয়তম প্যারিসকে বারবার সৃষ্টি করেছেন, সেই রকম কক্‌তোও প্যারিসেরই লেখক। যদিও, কক্‌তো-র রচনা বড় বিক্ষিপ্ত, অপরিপূর্ণ।

বহু মুখে ছড়িয়েছিলেন কক্‌তো নিজের প্রতিভা। উপন্যাস লিখেছেন, লিখেছেন নাটক, প্রবন্ধ, স্মৃতিকথা, চিত্রনাট্য। ফরাসী দেশের অধিকাংশ বড় কবিই বড় সজাগ অহংকারী, কবিতা ব্যতীত শিল্পের অন্যান্য শাখায় সহসা কার্যকারীভাবে প্রবেশ করতে চান না। কক্‌তো করেছিলেন, বহু জটিল শাখায়, ফলে ওঁর কবিতার ক্ষতি হয়েছে নিশ্চিত। ফিল্‌ম্ তোলার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত হয়েছিলেন, নাটক প্রযোজনা ও পরিচালনা করেছেন নিজে, এমন কি অভিনয় পর্যন্ত। নাটকই শেষ পর্যন্ত তাঁর শ্রেষ্ঠ বাহন ছিল, বহু পরীক্ষা করেছেন, পুরাণ মহাকাব্যের পুনরুত্থান, মধ্যযুগীয় প্রেম-কাহিনীর আধুনিক রূপ, মাত্র একটি চরিত্রের নাটক—ইত্যাদি।

অর্ধশতাব্দীর প্রত্যেকটি শিল্প-সাহিত্য আন্দোলনের পক্ষে-বিপক্ষে ভয়ংকরভাবে যুক্ত ছিলেন। কিউবিজম, ডাডাইজম, সুররিয়ালিজম—সব ক'টি পর পর পেরিয়ে এসেছেন—প্রখ্যাত বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে শেষ পর্যন্ত ছিলেন পিকাসো। ক্ষীণ, স্পর্শকাতর স্বাস্থ্য, তবু শরীরে গাঁজা, আফিং ও অন্যান্য মাদক সেবনের পরীক্ষা করেছেন। যৌবনে বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল প্রতিভাবান, অকাল মৃত লেখক রাদিগে-র সঙ্গে। ককতো পুরুষ-প্রেমের উপরেও বিশেষ জোর দিতেন।

১৯৬৪ সালের গোড়ার দিকে, তাঁর মৃত্যু প্যারিস শহরে যেন ইন্দ্রপাত ঘটিয়েছিল। রূপকথার মতো সেই মৃত্যু। কক্‌তো-র আন্তরিক বান্ধবী ছিলেন বিশ্ববিখ্যাত গায়িকা এদিথ্ পীয়াফ্—সেই এদিথ্ পীয়াফ্—যাঁর জন্ম পথের ভিখারিণী হিসেবে, ক্রমে ভবঘুরে, চোর, খুনে ও বারবনিতাদের জগৎ থেকে বেরিয়ে এসে শেষ পর্যন্ত যিনি উঠেছিলেন সমাজের শীর্ষে। কক্‌তো আর পীয়াফ পরস্পরের গুণমুগ্ধ। দুজনেই অসুস্থ—বারবার কক্‌তো ভৃত্যকে পাঠাচ্ছেন এদিথ্ কেমন আছে জেনে আসতে। একই দিনে, প্রায় এক সঙ্গেই দুজনের মৃত্যু।]

দুপুর

নাবিক, এখন দারু দেবদূত, ডানার আঘাতে
আফ্রোদিতির অস্ট্রিচ পাখি, হীরকের হার,
শান্ত সাগর থেকে নিয়ে আসে তোমার জন্য তটের প্রান্তে
বিশ্বাসী ঢেউ, মুক্তাখচিত টম্‌টমে জোড়া ক্লান্ত অশ্ব।

ভগ্ন জাহাজ, টিনের কৌটো, নোঙর, বরগা, মাস্তুল, আর
জেলিমাছ, নিচে জলের ভিতরে রাজধানী, তার বড় রাস্তার
জানালার থেকে তাকানো দৃষ্টি ; পরে সমুদ্র
ফিরে যায় ফের, নিজের মুখের লালা শুষে নিয়ে—।

আমি খুলে ফেলি পোশাক ও টুপি নেই মুহূর্তে
বালির উপরে উলঙ্গ দেহে চিত হয়ে শুই
বন্য রৌদ্রে শরীর পুড়িয়ে প্রতীক্ষা করি, বেরুবে কখন
আমাদের এই চামড়ার নিচে লুকিয়ে যে আছে, সেই ভারতীয়।

আনাড়ী পরীরা

আনাড়ী পরীরা তোমাদেরই অনুকরণ করেছে, হে পারাবত।
তোমরা মেরির বন্দনা গাও। ওরা সান্ত্রীর মঞ্চে
পাহারা দিচ্ছে ফরাসী রাজ্য। হায়! তবুও তো আমরা নিরাশ করেছি ওদের।

সারা রাত জেগে আকাশ তুলেছে রাশি রাশি যুঁই :
শেষ ফুলটিও তোলা হলে, ওরা খোলে জানালার ঝিল্লি।

এসেছে শরৎ, পরী ঝরানোর দিন এলো আজ
দুধের ভাণ্ড থেকে গড়ানোর মতো পরীদের এই ঝরে যাওয়া।

সোনালী বৃক্ষ অপেরায় বহু কমলালেবুর ফসল ফলেছে
শীর্ষদেশের কমলার প্রতি জনসাধারণ বড় উৎসুক
কারণ নিচের কমলার স্বাদ, ওদের সবারই মুখে বিস্বাদ।

দশ লাইনের এই কবিতাটি খুব সুন্দর নাকি কুৎসিত ?
কুৎসিতও নয় সুন্দরও নয়, অন্যরকম গুণ আছে ওর।

[কক্‌তো-র কবিতায় প্রাচীন কাব্যের গন্ধ ও বর্ণের সঙ্গে মিশ্রিত হয়েছে আধুনিকতা। কবিতার বহিরঙ্গ সজ্জায় অস্বাভাবিক দক্ষতা দেখিয়েছেন তিনি, কখনো কখনো নিখুঁত গঠনের কবিতায় যুক্ত হয়েছে তাঁর ডাডাইস্টদের ধরনে বিদ্রূপময় দৃষ্টিভঙ্গি। এসব সত্ত্বেও অনেক সময় তাঁর লেখা সম্পর্কে মনে হয় সার্থকভাবে রচিত অপ্রধান কবিতা। কবিতা সম্পর্কে কক্‌তো-র বিখ্যাত উক্তি : শ্রেষ্ঠতম রচনাও বর্ণমালার বিশৃঙ্খলতা ছাড়া, আর বেশি কিছু না। প্রথম কবিতাটি ইমপ্রেশানিস্টদের ধরনের রচনা। মাঝির কথা বলেই পরমুহূর্তে সে হয়ে গেল কাঠের তৈরী দেবদূত—দেবদূত ও পরী কক্‌তো-র অতি প্রিয় বিষয়—সেই দেবদূত ডানার আলোড়নে নিয়ে এলো আফ্রেদিতিকে। রোমানদের যেমন ভিনাস, গ্রীকদের সেই প্রেমের দেবী আফ্রেদিতি—সমুদ্রের ফেনা থেকে যাঁর জন্ম—যদিও কক্‌তো-র সমুদ্রে, ঢেউ একটু পরেই হয়ে গেল মুখে ফেনা মাখা টম্‌টম্ বা জুড়ীগাড়ির ঘোড়া। সমুদ্র থেকে যেমন উঠে এলেন আফ্রেদিতি—সেইরকমই প্রখর সূর্যের আলোর নিচে কবির চামড়া থেকে বেরিয়ে আসে এক গাঢ় রঙের ভারতীয়।]

পল এলুয়ার

[বলা যায়, ১৯২০ সাল থেকেই একরকম, পশ্চিমের সাহিত্য থেকে নারীর নির্বাসন হয়ে গেছে। নারীর বন্দনা, স্তুতি, সজ্জা—এতকাল ছিল যে-কোনো সাহিত্য সৃষ্টির প্রাণ, যেদিন থেকে লেখকরা মুখ ফিরিয়ে নিলেন, নারী ক্রমশঃ অবহেলিতা, অনাদৃতা হতে হতে অস্তিত্বহীনা হবার উপক্রম। মালার্মে বা ভালেরি কোনো মেয়েকে ভালোবাসা নিয়ে প্রেমের কবিতা লেখা প্রায় হাস্যকর মনে করতেন। ফ্রান্ৎস্ কাফ্কা, টমাস মান—সাত্র, কামু—হেন্‌রি মিলার, নরমান মেইলার—এঁদের রচনায় কোনো নায়িকা নেই বললেই চলে। নারী চরিত্র আছে নানা প্রয়োজনে, কিন্তু নারী নেই। হায় শ্বেতাঙ্গিনী!

পল এলুয়ার তাঁর অপর দুই ঘনিষ্ঠ বন্ধু—ব্রেতোঁ ও আরাগঁর সঙ্গে মিলে প্রায় যুদ্ধে নেমেছিলেন নারীর লুপ্ত মহিমা পুনরুদ্ধারের জন্য। সুররিয়ালিস্টদের আদি ও প্রবল সমর্থক এলুয়ার বললেন, নারীই রহস্যের সিন্ধু। পৃথিবীর সব রহস্যেরই উন্মোচনের চেষ্টা করা যায় নারীর শরীরে ও ভালোবাসায়। এলুয়ার রমণীর বন্দনা করেছেন নির্লজ্জ, দ্বিধাহীন, সরল, আত্মার স্পষ্ট ভাষায়। পেত্রার্কের সময় থেকে শুরু হয়েছে যে প্রেয়সী বন্দনা, এলুয়ার যেন সেই ধারারই আধুনিক পূজারী। এবং তাঁর সার্থক সঙ্গী লুই আরাগঁ।

পল এলুয়ারের জন্ম ১৮৯৫, (কোনো কোনো বইতে দেখছি ১৮৯৭, আমার পক্ষে ঠিক করা সম্ভব নয়। তাঁর নামটিও যে ছদ্মনাম, এ তথ্যও সুপরিচিত নয়। ইউজিন গ্রাঁদেল নামের লোকটি যে কেন স্বনাম ত্যাগ করে সারা জীবন পল এলুয়ার নামেই লিখেছেন জানতে পারিনি।) ব্যক্তিগত জীবনে তিনি নানান ঘটনার সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত থাকতে চাইতেন। নির্জন ঘরে নিজের মুখোমুখি হওয়া নয়, এলুয়ার চেয়েছেন পৃথিবীর মানুষের মধ্যে নিজেকে খুঁজতে। কৈশোরে ফুসফুসের অসুখ হয়, তার পর প্রথম মহাযুদ্ধে আক্রান্ত হন বিষাক্ত গ্যাসে। তবু বেঁচে উঠে, নিজের মধ্যে বোধ করলেন একটা পরম ছটফটানি, নির্দিষ্ট নিয়মহীনতা। সেই টানে যোগ দিলেন ডাডাইস্টদের আন্দোলনে, কিছুদিন পর সুররিয়ালিস্টদের দলে, প্রবলভাবে মেতে উঠলেন, তারপর আবার একদিন বিকেলবেলা প্রিয় বন্ধু পিকাসোর কাঁধে হাত দিয়ে গিয়ে দুজনেই নাম লিখিয়ে এলেন কম্যুনিস্ট পার্টিতে। আবার, নাৎসীরা যখন ফরাসী দেশ অধিকার করে, তখন গোপন মুক্তিযুদ্ধে লড়াই করেছেন সৈনিক হয়ে। মৃত্যু ১৯৫২।]

প্রেয়সী

সে আছে দাঁড়িয়ে আমার চোখের পাতায়
তার চুল এসে মিশেছে আমার চুলে
আমার হাতের মতো অঙ্গের গড়ন হয়েছে তার
আমার চোখের মতো তার রং দেখেছি চক্ষু খুলে
তাকে আমি গ্রাস করেছি নিজের ছায়ায়
বিশাল আকাশে যেমন হেলানো পাহাড়।
তার দুই চোখ খোলা সারা দিন রাত
আমায় কিছুতে দেয় না কখনো ঘুমোতে
খাঁটি দিবালোকে স্বপ্ন দেখে সে, স্বপ্নের সংঘাত
এমনকি ঐ সূর্যকে দেয় উবিয়ে, যেমন কর্পূর

স্বপ্ন দিয়ে সে হাসায়, কাঁদায়, হাসায়, কথার স্রোতে
টেনে নিয়ে যায়, কিছুই বলার নাই থাক্
আমি কথার নেশার ভরপুর ।

ঈষৎ বিকৃত

বিদায় বিষাদ
স্বাগত বিষাদ
তুমি আঁকা আছো দেয়ালের কড়িকাঠে
তুমি আঁকা আছো আমার ভালোবাসার চোখে
তুমি নও সম্পূর্ণ দুঃখ
কেননা দরিদ্রতম ওষ্ঠও তোমাকে
ফিরিয়ে দেয়
একটুকরো হাসিতে

স্বাগত বিষাদ
রমণীয় শরীরের ভালোবাসা
ভালোবাসার তেজ
তার মনোহরণ জেগে ওঠে
অশরীরী দানবের মতো
ব্যর্থকাম মস্তিষ্ক
বিষাদ সুন্দর মুখ

[১৯৪২-এ ফরাসী দেশের মুক্তিযুদ্ধে হাতে বন্দুক নিয়ে অসম সাহসীর মতো যখন লড়াই করেছেন এলুয়ার, দেখেছেন নিজের দেশের অসংখ্য মানুষের অবর্ণনীয় দুর্দশা, তখনও তিনি প্রেমের কবিতায় বিশ্বাস হারাননি। তখনও তিনি বিশ্বাস করতেন, একটি মেয়েকে ভালোবাসাই সব ভালোবাসার প্রথম সোপান, সেই ভালোবাসা থেকেই জন্ম হয় স্বাধীনতা ও পৃথিবীর সমস্ত মানুষের প্রতি ভালোবাসার। ভালোবাসা হচ্ছে সেই প্রবল আকর্ষণ যা দুটি নারী-পুরুষকে কাছে আনে, সর্বাঙ্গের রক্ত-মাংসের স্পর্শে জন্ম হয় সত্যিকারের পরিচয়, 'আমি' তখন বদলে 'তুমি' হয়ে যায়। 'তোমাকে ভালোবেসেই আমি পৃথিবীর মানুষের কাছে ফিরে এলাম।'

এলুয়ার যখন মেয়েদের বর্ণনা করেছেন, তাদের চুল, ওষ্ঠ, গ্রীবা, স্তন, জঙ্ঘা—সব কিছুর মধ্যেই একটা আশ্চর্য নম্র কমনীয়তা আছে। কোনো অঙ্গই তাঁর বর্ণনায় পৃথক নয়, নারীর একটি হাতও সম্পূর্ণ নারী। 'রুহিতনের বিবি' নামে তাঁর বিখ্যাত কবিতার এক জায়গায় আছে, 'ভালোবাসাকে ভালোবেসে'—অর্থাৎ সেন্ট অগাস্টিন যেমন বলেছিলেন, 'প্রেমের প্রেমে পড়া'—একটি মেয়েকে ভালোবাসার পর—ভালোবাসাতেই চক্ষু আচ্ছন্ন হয়, বদলে যায় এই জগৎ—আমার আর বিশ্বচরাচরের মধ্যের সব ব্যবধান তুচ্ছ হয়ে যায়, সহপাঠিনী বালিকা হয় পৃথিবীর যে-কোনো বা সমস্ত নারী।]

লুই আরাগঁ

[প্রেমিকাকে নিয়ে কবিরা ঢের কবিতা লিখেছেন ও লিখবেন। কিন্তু প্রেমিকার সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেলে তারপর আর তাকে নিয়ে কবিতা লেখার রেওয়াজ নেই বিশেষ। নিজের স্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে প্রেমের কবিতা লেখার ফ্যাশন কোনো দেশেই নেই। দু' একজন কেউ লিখলেও, নাম না দিয়ে কিছুটা অস্পষ্ট বর্ণনায় এমন ভাব করা হয়, যেন কোনো অচিন-প্রিয়া, ইত্যাদি। রাধাকৃষ্ণ বা ত্রিস্তান-ইসোল্টের কাল থেকেই প্রেমের কবিতার নায়িকা পরস্ত্রী বা অনূঢ়া।

কিন্তু আরাগঁ লিখেছেন, প্রবল ও নির্লজ্জভাবে। তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থের নাম 'এল্‌সার চোখ'। এলসা ত্রিয়োলেট নামের রাশিয়ান নারীকে বিয়ে করার পর বহু কবিতায় উল্লেখ করেছেন।

জন্ম ১৮৯৭। আরাগঁ-র জীবনের ঘটনাগুলি অনেকটা তাঁর বন্ধু এলুয়ারের মতোই। দুজনেই প্রথম মহাযুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন। আরাগঁ বীরত্বের জন্য পদক পান। তারপর ডাডাইজম আন্দোলনের স্বেচ্ছাচারে যোগদান। পরে সুররিয়ালিজম। আরও পরে কম্যুনিজম। আবার দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে সৈনিক হিসেবে যুদ্ধ। এই সময়ে প্রকাশিত পর পর দুটি কাব্যগ্রন্থ 'ভগ্নহৃদয়' ও 'এল্‌সার চোখ'—এতে যুদ্ধ ও দেশাত্মবোধের সরল কবিতাগুলি তাঁকে জনপ্রিয়তার শিখরে পৌঁছে দেয়।

গদ্য-লেখক হিসেবেও আরাগঁ-র সুনাম আছে। তাঁর তিনখানি উপন্যাস ফরাসী ভাষায় কবিত্বময়তায় বিশিষ্ট। কিন্তু কবি হিসেবে তাঁর স্থান কোথায়—এ নিয়ে এখন বিপুল মতভেদ দেখা গিয়েছে। তাঁর রাজনৈতিক সহকর্মীদের মতে, তিনি এ যুগের একজন মহাকবি; অন্যদের মতে তিনি একটি বিপুল ব্যর্থতা। রাজনীতি-নিরপেক্ষ সমালোচকদের মধ্যেও এরকম মতভেদ। কারণ, আরাগঁ চান জনতার কাছে তাঁর রচনার সম্পূর্ণ আবেদন পৌঁছে দিতে, এবং তিনি বেছে নিয়েছেন কবিতার প্রথাসিদ্ধ রীতি ও সরল, মর্মস্পর্শী বিষয়। তাঁর ছন্দ ও শব্দ ব্যবহার ক্রমশ হয়ে উঠছে প্রত্যক্ষভাবে অনাধুনিক কবিতার মতো, অর্থাৎ চলিত ভাষায় আমরা যাকে পদ্য বলে থাকি। নিম্নোদ্ধৃত কবিতার অনুবাদেও আমরা আমাদের সচরাচর অব্যবহার্য কয়েকটি পুরোনো শব্দ ব্যবহার করে সেই পুরোনো ভাবটি আনার চেষ্টা করেছি।

যুদ্ধের সময় লেখা আরাগঁ-র 'দ্বিতীয় রিচার্ড চল্লিশ' কবিতাটিই সবচেয়ে বিখ্যাত। এই কবিতাটি একসময়ে লোকের মুখে মুখে ফিরেছে। এবং এখনও যুদ্ধের উপরে লেখা সার্থক কবিতা হিসেবে এর কৃতিত্ব সমসাময়িকতা ছাড়িয়ে আছে।]

লিলি ও গোলাপ

কুসুমের মাস রূপান্তরের মাস
মে মেঘহীন জুনের পৃষ্ঠে ছুরি
ভুলবো না আমি লিলির গুচ্ছ গোলাপের নিশ্বাস
বসন্তে আরও লুকানো যে মঞ্জরী

ভুলবো না আমি কখনো করুণ মায়ায় দৃশ্যমান
জনতার স্রোত চিৎকার রোদ্দুরে
ভালোবাসা-মোড়া সাঁজোয়া বাহিনী বেলজিয়ামের দান
বাতাস ও পথ কাঁপে মাছিদের ভনভনানির সুরে

বিবাদের আগে দ্রুত হঠকারী জয় অধিকার পায়
সুন্দরীদের লাল চুম্বন রক্তপাতের অগ্রিম
মৃত্যুর কাছে যারা যাবে তারা দাঁড়িয়ে বারান্দায়
ফুলের মালায় ভরে গেছে বুক জনতার হিমসিম

ভুলবো না আমি ফ্রান্সের সেই প্রিয় উদ্যানগুলি
ওরা যেন বহু প্রাচীন কালের ভোরে প্রার্থনা গান
নৈঃশব্দের ধাধা সন্ধ্যার যাতনা কেমনে ভুলি
ছিল আমাদের যাত্রার পথে গোলাপ যে অফুরান……

……থেমে গেছে সব শত্রু এখন ছায়ায় নিয়েছে বাস
প্রিয় প্যারিসের পতন শব্দ শত্রুর মুখে শোনা
ভুলবো না আমি লিলির গুচ্ছ গোলাপের নিশ্বাস
এবং আমার দুই ভালোবাসা হারিয়েছি ভুলবো না

প্রথম দিনের লিলির স্তবক ফ্লান্ডার্সের ফুল
মৃত্যু যে রঙ গন্ধে মেশায় ফুলে সেই জাগরণী
আর তুমি হায় কোমল গোলাপ অপসরণের ভুল
আঁজুর গোলাপ তোমার বর্ণ দূর কামানের ধ্বনি

[এই কবিতার কয়েকটি উল্লেখ স্পষ্টভাবে বুঝতে হলে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের দুটি মাসের ইতিহাসে ফিরে যেতে হয়। ১৯৪০-এর মে-জুন। আরাগঁ তখন সৈন্যবাহিনীতে। মে মাসে ফরাসী বাহিনীর মধ্যে জয়ের ছদ্ম আশা জন্মেছিল। মে মাসের স্নিগ্ধ সূর্যালোকে সাদা লিলি ফুল সেই ভুল আশার প্রতীক। ফরাসী বাহিনী চলেছে আলরিয়ার খালের দিকে প্রতি-আক্রমণে, বেলজিয়ামের অকৃপণ সাহায্য, সেই উপলক্ষে নাগরিকদের উৎসব। যুদ্ধের ট্যাংকগুলো ভালোবাসায় মোড়া—অর্থাৎ, পশ্চিম দেশের যেমন রীতি—যুদ্ধে যাবার সময় সুন্দরী তরুণীরা দলে দলে ছুটে এসে গাড়ির ওপর উঠে সৈনিকদের আলিঙ্গন-চুম্বন দেয়। সৈনিকদের গালে সেই লালচে লিপস্টিকের দাগ—যেন তাদের আসন্ন মৃত্যু-পরোয়ানা। গোলাপ ভয়ংকর জুন মাসের ফুল—যে জুন মাসে আশাভঙ্গ এবং পশ্চাদপসরণ। ১৪ই জুন প্যারিসের পতন। পরাজিত সৈন্যদের ফিরে আসার পথে আর কোনো অভ্যর্থনা নেই, উৎকট স্তব্ধতা, শুধু পথের পাশে পাশে লাল গোলাপের ঝাড়। দুই ভালোবাসাকে হারানো—অর্থাৎ প্রিয় প্যারিস ও প্রিয়তমা এলসা।

প্যারিসের বাগানগুলির সঙ্গে প্রার্থনা গানের তুলনা—একটু দূরান্বয়ী মনে হতে পারে, মূল কবিতায় আছে missel, অর্থাৎ ইংরেজি missal—আগেকার রোমান ক্যাথলিক গির্জায় রক্ষিত প্রার্থনা সংগ্রহ-পুস্তক। প্রার্থনা-পুস্তকের সঙ্গে বাগানের তুলনা এই হিসেবে হতে পারে, যে রঙিন ফুলের চৌখুপ্পি করা বাগানের সঙ্গে নানা বর্ণে চিত্রিত প্রার্থনা-পুস্তকের দৃশ্যত সাদৃশ্য। তেমনি আঁজুর গোলাপ, মূল কবিতায় আঁজু শব্দটি ছিল লাইনের শেষে। আঁজু অঞ্চলের গোলাপ এমন কিছু বিখ্যাত নয়—তবু কেন আঁজুর উল্লেখ—আগে ফ্লান্ডার্সের ফুল বলার তবু মানে হয়, কারণ সৈন্যবাহিনী এগিয়েছিল ফ্লান্ডার্স দিয়ে—কিন্তু আঁজু? ওটা মনে হয় এসেছে মিলের খাতিরে—কবিদের এরকম স্বভাব আছেই।

মূল কবিতা থেকে আট লাইন আমি বাদ দিয়েছি। মূল কবিতায় আছে লাইল্যাক ফুল, কিন্তু বাংলায় লিলি নামটা পরিচিত। মে মাসে লিলি ফুল ফোটার কথা তো আমরা ছেলেবেলা থেকেই পড়েছি।]

আঁরি মিশো

[সাম্প্রতিক ফরাসী কবিতায় দুই সৃষ্টিশীল প্রধান কবি মিশো এবং বনফোয়া। আঁরি মিশো এখন বয়সে প্রবীণ—কিন্তু এই অভিমানী, আত্মভুক, পাগলাটে পুরুষটি ফরাসী কবিতার একটি বিশেষ দিকের প্রতিনিধি।

মানুষের মনের ভিতরের হিংস্র, ভয়ংকর জগৎ থেকে দানবগুলিকে বার বার টেনে এনেছেন, কিন্তু মুক্তি বা রূপান্তরে বিশ্বাস করেননি মিশো। এই কবি নৈরাশ্যবাদী। অর্থাৎ অন্তর্জীবনের অজ্ঞানকে আবিষ্কার ও মনুষ্যত্বের রূপান্তর নয়, তাঁর কবিতা কবিতার মধ্যেই শেষ। কবিতা লিখে মানুষের উন্নতি করতে তিনি আসেননি, বরং নিজের সঙ্গে এক প্রচণ্ড যুদ্ধ, যে যুদ্ধে জয়-পরাজয় কিছুই নেই, জীবন এই রকমই—তীব্র, নির্বাচিত ভাষায় আঁরি মিশো লিখে চলেছেন। বোদলেয়ারের পর থেকে ফরাসী কবিতায় মেটাফিজিকাল দিক যে ক্রমশ কমে আসছে, মিশোই তার চরম উদাহরণ। তাঁর লেখায় প্রতীকের ব্যবহার খোঁজা নিরর্থক। কবিতা জীবনযাপনের প্রতিটি মুহূর্তের মতো, প্রত্যেকটি কবিতারই আলাদা অস্তিত্ব আছে, মানুষ বা মুহূর্তের মতোই তার জন্ম-মৃত্যু।

মিশো-কে প্রথম অভ্যর্থনা জানান আঁদ্রে জিদ। মিশো সম্পর্কে তিনি প্রবন্ধ লিখেছেন। মিশোর জন্ম ১৮৯৯, আসলে জাতে বেলজিয়ান। ব্রাসেল্‌সে ডাক্তারি পড়তে পড়তে হঠাৎ পড়া ছেড়ে দিয়ে নাবিকের চাকরি নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন সমুদ্রে। সেই সময়ে ঘুরেছিলেন উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার বন্দরে। ফিরে এসে প্রথম লেখা শুরু করলেন। পঁচিশ বছর বয়সে প্যারিসে এসে আস্তানা নিলেন। সেই সময় সুররিয়ালিস্ট আন্দোলন প্রবল, মিশো ওই পালকেরই পাখি, কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে যোগ দেননি ঈর্ষাবশত, ব্রেতোঁ-র একনায়কত্বের জন্য। আবার ভ্রমণ এসিয়া মহাদেশ। ফিরে এসে প্রবল কবিতা ও ছবি আঁকা নিয়মিত। রুগ্ন শরীর, কিন্তু গত এক দশক গাঁজা, মেস্কালিন, হাসিস, আফিম ইত্যাদি মাদকদ্রব্য ব্যবহার করে পরীক্ষা করছেন। পরীক্ষা, নেশা নয়।

এসিয়া মহাদেশ ভ্রমণের পর একটি বই লিখেছিলেন, 'এসিয়ার এক বর্বর'। সে বইয়ের কোনো কোনো মন্তব্যে এ দেশের অনেকে গোঁড়া লোক খুশী হন না, কিন্তু বইটি ভারী মজার।]

একজন শান্ত মানুষ

বিছানা থেকে হাত বাড়িয়ে দেয়াল ছুঁতে না পেরে প্লুম অবাক হয়ে গেল। সে ভাবলো, 'হুঁ, পিঁপড়েতে খেয়ে গেছে...' এবং সে আবার ঘুমিয়ে পড়লো। একটু পরেই ওর স্ত্রী ওকে জড়িয়ে ধরে ঝাঁকানি দিতে দিতে বললো, 'কুঁড়ের যম, একটু চোখ মেলে দ্যাখো, তুমি যখন ঘুমিয়ে কাদা, তখন ওরা আমাদের বাড়িটা চুরি করে নিয়ে গেছে।' এবং সত্যিই ওদের চারপাশে সীমাহীন আকাশ ছড়ানো। 'বাঃ, হয়ে যখন গেছেই...' সে ভাবলো। তারও একটু পরে সে একটা শব্দ শুনতে পেল। একটা ট্রেন প্রচণ্ড গতিতে ওদের দিকে ছুটে আসছে। 'যে-রকম জোরে ওটা আসছে, তা দেখে মনে হয়' সে ভাবলো, 'আমরা পালাবার আগেই...' এবং সে আবার ঘুমিয়ে

পড়লো। তারপর শীত তার ঘুম ভাঙালো। ওর সমস্ত শরীর রক্তে ভেজা। ওর স্ত্রীর টুকরো টুকরো দেহ পাশে পড়ে আছে। সে ভাবলো, 'রক্ত-টক্ত থাকলে অনেক বিশ্রী ব্যাপার পর্যন্ত গড়ায় ; ট্রেনটা যদি সত্যিই না আসতো, আমি খুবই খুশি হতাম। কিন্তু যখন কাণ্ডটা ঘটেই গেছে…' সে আবার ঘুমিয়ে পড়লো।

—তা হলে, বিচারক বললেন, তুমি এর কি কারণ দেখাতে পারো যে, তোমার স্ত্রী যখন অমন ভয়ংকরভাবে নিজেকে টুকরো টুকরো করলো—লোকেরা ওর লাশ আটটা টুকরোয় ভাগ করা দেখেছে—এবং তুমি পাশে শুয়ে থেকে ওকে এ কাজে বাধা দেবার কোনো চেষ্টাই করোনি, এমন কি তুমি কিছু লক্ষ্যই করোনি। এটাই আসল রহস্য। পুরো কেসটা এর ওপরই নির্ভর করছে।

'এই মামলায় আমি ওকে কোনো সাহায্যই করতে পারবো না', প্লুম ভাবলো, এবং সে আবার ঘুমের মধ্যে ফিরে গেল।

—ফাঁসি হবে কাল সকালে। আসামী তোমার কিছু বলার আছে ?

—মাপ করবেন, আমি কেসটা গোড়া থেকে কিছুই শুনিনি। সে বললো। এবং আবার ঘুমিয়ে পড়লো।

আগামীকাল এখনো নয়…

ঘোরো, ঘোরো, দ্বিমুণ্ড ভাগ্য,
আমাদের ব্যাণ্ডেজমোড়া শরীরের গ্রহগুলি থেকে ছিটকে ওঠা
গভীর গতি, ঘোরো।

দেরীর জন্য সূর্য,
আবলুশ ঘুম,
আমার স্বর্ণফলের বুক।

দু' হাত ছড়িয়ে
আমরা আলিঙ্গন করি ঝড়,
আমরা আলিঙ্গন করি আয়তন,

আমরা আলিঙ্গন করি বন্যা, আকাশ, ব্রহ্মাণ্ড,
আমাদের সঙ্গে যা-কিছু আজ আমরা আলিঙ্গন করেছি,
ফাঁসি কাঠের উপরে রতি-ক্রীড়ায়।

[অনুবাদের সীমাবদ্ধতা, অনুবাদকের অক্ষমতা ইত্যাদি প্রশ্নে এখানে আঁরি মিশোর দুটি প্রায় অপ্রধান কবিতাই অনূদিত হল। তাঁর বিখ্যাত কবিতাগুলির মধ্যে 'আমার রাজা'—যে কবিতায় কবি নিজস্ব মধ্যরাত্রে জেগে উঠে নিজের রাজার সঙ্গে লড়াই করছেন কিংবা 'দুর্ঘটনার পর' প্রভৃতি কবিতা অনুবাদেই মিশোর সত্যিকারের পরিচয় বোঝা যেতো।

ফ্রান্‌ৎস্ কাফকা এই শতাব্দীতে যে ধরনের গদ্যলেখক, কবিতায় আঁরি মিশোও অনেকটা তাই। কাফ্‌কার চরিত্র জোসেফ কে-র মতো, বা আলবিয়ার কামুর মেরশো-র মতো, প্লুম নামের

চরিত্রটিও মিশোর বহু কবিতায় ঘুরে ঘুরে এসেছে।

প্লুম হচ্ছে আধুনিক মানুষের প্রতিভূ—যে এই নিষ্ঠুর এবং দুর্বোধ্য জগতের মধ্যে জড়িয়ে পড়েছে। মিশো কখনো কখনো এই লোকটিকে প্রচণ্ড বিদ্রূপও করেছেন, ওকে ক্লাউন বানিয়েছেন।]

ফ্রাঁসিস পঁঝ

ফ্রাঁসিস পঁঝকে মনে হয় ফরাসী কবিতার-ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন, একক। বোদলেয়ার থেকে শুরু হয়েছে যে হৃদয়-খোঁড়া, অজ্ঞাত প্রদেশের উদ্ভাসন, পঁঝ সে পথে যাননি। তাঁর কবিতার মূল বিষয় মানুষ নয়, বস্তু। কাঠ, লোহা, জল, সিগারেট, দেশলাই, শামুক, বরফ, ঝিনুক—এইগুলিই তাঁর চোখের কেন্দ্র, বস্তুর চরিত্র অনুযায়ীই তিনি মানুষের সম্পর্কের কথা ভেবেছেন। পাস্‌কালের স্বধর্মী পঁঝ বহির্জগতে ধ্যানমগ্ন, প্রতিদিনের দেখা জড়পদার্থের মধ্যেই তাঁর কবিত্বের আবিষ্কার। এই সব বস্তুকে তিনি জীবনের চরিত্র দিয়েছেন, কিন্তু নিজের জীবনের সঙ্গে মেলাননি, সেই হিসেবে পঁঝ প্রতীকধর্মী নন।

পঁঝের এই নির্লিপ্তভাবে গল্প বলার ভঙ্গিতে কবিতা, তাঁর পরবর্তীদের মধ্যেও অনুকারী বা অনুসারী সৃষ্টি করেনি, কবিতার চরিত্রে ফরাসী কবিতায় তিনি বিশেষ উল্লেখযোগ্য অনন্য, কিন্তু ১৯৫০-এর পর কিছু আধুনিক ঔপন্যাসিক, এল্যাঁ রব গ্রিয়ে বা মিশেল বুতর—এঁদের রচনায় পঁঝের প্রভাব স্পষ্ট।

জন্ম ১৮৯৯। বাবা ছিলেন ইংরেজির অধ্যাপক, তাঁর কাছে এবং প্যারিসের বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনো করে সাংবাদিকতা এবং পুস্তক প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানে চাকরি নিয়েছিলেন। সুররিয়ালিস্টদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল, কিন্তু অপ্রত্যক্ষ। ঘটনাহীন জীবন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় গুপ্ত প্রতিরোধ আন্দোলনে সাংবাদিকদের সংগঠন করেছিলেন। ১৯৫২ সাল থেকে প্যারিসের আলিয়াঁস ফ্রাঁসেজে অধ্যাপনা করছেন।]

তিনটি দোকান

বড় রাস্তার কাছে, যেখানে রোজ খুব ভোরে আমি বাসের জন্য দাঁড়িয়ে থাকি, তিনটি পাশাপাশি দোকান। একটি সোনারূপোর, একটি কয়লা আর কাঠের, আরেকটি মাংসের। দোকান তিনটির দিকে পর পর তাকিয়ে আমি লক্ষ্য করি স্বভাবের বিভিন্নতা, আমার চোখে ধাতু, মূল্যবান পাথর, কয়লা ও জ্বালানি কাঠ এবং মাংসের টুকরো।

ধাতুগুলি সম্পর্কে বেশীক্ষণ ভাবার দরকার নেই—ওরা কাদা-মাটির ওপর মানুষের ভয়ংকর বা নিরূপিত প্রচেষ্টার ফল—অথবা প্রাকৃতিক আলোড়ন—যার কোনো উদ্দেশ্য ছিল না। মূল্যবান পাথরগুলি সম্পর্কেও তাই, ওদের দুর্লভতাই আমাদের কিছু নির্বাচিত শব্দের বর্ণনা দিতে বাধ্য করে—প্রকৃতির সম্পর্কেও যেরকম শুদ্ধ বর্ণনা।

মাংসের ব্যাপারে, দেখা মাত্রেই আমি কেঁপে উঠি, এক ধরনের আতঙ্ক অথবা সহানুভূতি আমাকে আলাদা হতে বাধ্য করে। তা ছাড়া, সদ্য ছাড়ানো

মাংস—একটা সূক্ষ্ম কুয়াশা বা ধোঁয়ার আস্তরণ আড়াল করে রাখে—আক্ষরিক অর্থে খাঁটি সংস্কারাদি যাঁরা প্রকাশ করতে চান—তাঁদের চোখ থেকেও। ওর কেঁপে ওঠা স্বভাবের দিকে এক মুহূর্তের জন্যও আমার মনোযোগ গেলে—আমার যা বলার বলতে পারবো।

কিন্তু কাঠ ও কয়লা সম্পর্কে চিন্তা—সত্যিকারের আনন্দের উৎস—সরল, নিশ্চিন্ত এবং শান্ত আনন্দ—যা আমি খুশী মনে ভাগ করে নিতে চাই। এর বর্ণনা দিতে আমার পাতার পর পাতা লাগা উচিত, এখানে আমার মাত্র আধ পাতা সীমা, সুতরাং আপনাদের চিন্তার জন্য আমি সূত্রাকারে এই বিষয়ের আভাস দিচ্ছি :

১) ভেকটরে অধিকৃত সময় সর্বদাই নিজের প্রতিশোধ নেয় মৃত্যুতে।

২) ধূসর—কারণ ধূসরই হচ্ছে অঙ্গার হবার পথে সবুজ ও কালোর মধ্যবর্তী পথ, কাঠের ভাগ্যে আরও—যদিও সামান্যতম—আছে একটি রোমাঞ্চকর গল্প, অর্থাৎ একটি ভুল, হঠকারিতা, এবং সমস্ত সম্ভব ভুল বোঝাবুঝি।

দেশলাই

আগুন দেশলাই কাঠিকে শরীর দেয়
একটি জীবন্ত শরীর, তার ভঙ্গি
তার পদোন্নতি, একটি সংক্ষিপ্ত গল্প
উৎস থেকে জ্বলে ওঠে গ্যাস
তাকে দেয় ডানা ও পোশাক, এমন কি শরীর ;
একটি গতিময় আকার
এবং সঞ্চরমাণ। খুব দ্রুত।

একমাত্র তার মাথাটাই শুধু কঠিন বাস্তবের সংঘর্ষে
শিখায় জ্বলতে পারে,
খেলার মাঠে স্টার্টারের পিস্তলের মতো তখন এর শব্দ।
কিন্তু যে মুহূর্তে ধরা হলো
শিখা
সরল রেখায়, দ্রুত—জাহাজের পাল
ঝুলে পড়ার মতো—
কাঠের রুপালী বর্ণে উঠে আসে,
এবং তাকে ছোঁয়া মাত্রই
পুরোহিতের মতো কালো করে
রেখে যায়।

[বস্তুকে মানবজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখেন বলেই পঁঝের কবিতা আবেগময় নয়, বরং যুক্তিগ্রাহ্য এবং কঠিন। তাঁর শব্দ ব্যবহারও খুব নির্বাচিত এবং বৈজ্ঞানিক পরিভাষাময়। এ ধরনের দুরূহ কবিতা, বাংলায় বোঝাবার জন্য আমারা অবশ্য সরল ভাষাই ব্যবহার করেছি।

প্রথম কবিতায়, ভেকটর শব্দটির আমি বাংলা পরিভাষা পাইনি। জ্বালানি কাঠের আশু রূপান্তর বোঝাতে এই শব্দটি ব্যবহার করেছেন। ভেকটর অঙ্কের শব্দ, বাংলা অঙ্কের পত্রিকা "অঙ্ক-ভাবনা"র প্রথম সংখ্যায় ভেকটরের এই সংজ্ঞা পেলাম : 'ভেকটর গণিত শাস্ত্রমতে নিছক পরিমাণ, এই ভেকটরের মানগুণ্য (magnitude) এবং দিক অভিমুখ নির্ণীত থাকে। সাধারণত, ভেকটরের ব্যাপার হিসাবে বেগ এবং জোর ধরা হয়।']

জাক প্রেভের

[বিংশ শতাব্দীর ফরাসী কবিদের মধ্যে জাক প্রেভের নিঃসন্দেহে সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়। জনপ্রিয়তার জন্য যা যা দরকার, সহজ বোধ্যতা, শব্দের চমক ও খেলা, লঘু সুর, চেনাশুনো বিষয় নিয়ে ঠাট্টা ইয়ার্কি, জাক প্রেভের এরই সব-কটাতেই খুব সিদ্ধহস্ত। কবি হিসেবে যথেষ্ট নিম্নমানের, কিন্তু তাঁর কবিতার বই হু-হু করে বিক্রি হয়, প্যারিসের নাইট ক্লাবে প্রেভেরের গান, রেকর্ড, রেডিও ফিল্মেও ঘন ঘন তাঁর রচনার ব্যবহার। কিন্তু কবি হিসেবেও প্রেভেরকে সম্পূর্ণ অবহেলা করা যায় না। তাঁর ছন্দ ও শব্দের ব্যবহার—বহু প্রতিষ্ঠিত কবির কাছেও ঈর্ষণীয়। প্রেভের যদিও নিজের কবিতা সম্পর্কে বলেন, তিনি মজা করার জন্য, নিজেকে খুশী করার জন্যই কবিতা লেখেন, কিন্তু তাঁর সূক্ষ্ম বিদ্রূপবোধ এবং খেলো ও কথ্য শব্দের মধ্যে কবিত্বের বিকাশ সমালোচকরাও স্বীকার করেছেন। যে কোনো সংকলনে তাঁর স্থান নিশ্চিত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

বাংলাদেশেও প্রেভের কিছুটা পরিচিত। বিষ্ণু দে ও অরুণ মিত্র প্রেভেরের অনুবাদ করেছেন। একটি দীর্ঘ কবিতার অনুবাদ আছে নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর।

প্রেভেরের জন্ম ১৯০০ সালে। যথারীতি, সমবয়েসীদের মতো উনিও সুররিয়ালিজম, কমুনিজমের স্তর পেরিয়ে এসেছেন পর পর। সিনেমার গল্প লিখেছেন কয়েকটি, তা ছাড়াও সাময়িকপত্রে ছোটগল্প ও রেকর্ডের জন্য গান লেখেন। প্রেভেরের রচনা অনেকটা স্বভাবকবিদের মতো স্বতঃস্ফূর্ত—এবং প্রতিদিনের দেখা চরিত্র—অর্থাৎ পুরুত, অধ্যাপক, রাজনৈতিক নেতা, পুলিস—যাদের হাতে সাধারণ নিরীহ মানুষ নিয়ত অত্যাচারিত হচ্ছে—প্রেভেরের বিদ্রোহ তাদের বিরুদ্ধে। এবং তাঁর বিদ্রূপের ধরন নানা অসঙ্গতির মধ্যে চরিত্রগুলোকে জট পাকিয়ে উলটোপালটা এলোমেলো করে দেওয়া।]

তোমার জন্য হে আমার প্রেম

পাখির বাজারে গিয়েছি আমি
        পাখি কিনেছি
        তোমার জন্য
        হে আমার প্রেম
ফুলের বাজারে গিয়েছি আমি
        ফুল কিনেছি

তোমার জন্য
হে আমার প্রেম
লোহার বাজারে গিয়েছি আমি
শিকল কিনেছি
কঠিন শিকল
তোমারই জন্য
হে আমার প্রেম
তারপর ক্রীতদাস-দাসীদের বাজারে গিয়েছি
এবং খুঁজেছি
তোমাকে পাইনি
হে আমার প্রেম

শোভাযাত্রা

সোনায় মোড়া একটি বৃদ্ধের সঙ্গে একটি দুঃখিত ঘড়ি
রানী পরিশ্রম করছেন এক ইংরেজের সঙ্গে
আর মাছ-ধরা শান্তির জাহাজের সঙ্গে সমুদ্রের অভিভাবক
ব্যঙ্গনাট্যের বীরপুরুষ, তার সঙ্গে মৃত্যুর বোকা হাঁস
কফির সাপের সঙ্গে এক চশমা পরা কারখানা
দড়ির খেলার শিকারীর সঙ্গে এক বহুমুণ্ডের নর্তকী
ফেনার সৈন্যাধক্ষের সঙ্গে এক অবসরপ্রাপ্ত তামাকের পাইপ
কালো পোশাকে সজ্জিত এক পেছন নোংরা শিশুর সঙ্গে একটি
নিকারবোকার পরা ভদ্রলোক
ফাঁসি কাঠের গান লেখকের সঙ্গে একটি গায়ক পাখি
বিবেক সংগ্রাহকের সঙ্গে এক সিগারেট-টুক্‌রোর পরিচালক—
বাংলাদেশের একটি কচি সন্ন্যাসিনীর সঙ্গে একটা ধর্মীয় মঠের বাঘ
পোর্সিলিনের এক অধ্যাপকের সঙ্গে একজন দর্শন-মেরামতকারী
রাউন্ড টেবিলের একজন ইন্সপেক্টরের সঙ্গে প্যারিস গ্যাস
কোম্পানীর বীরবৃন্দ
সেন্ট হেলেনের একজন হাঁসের সঙ্গে টোমাটোর রস দিয়ে রান্না
করা একটি নেপোলিয়ান
নিম্নাঙ্গের এক সদস্যের সঙ্গে ফরাসী আকাদেমির পিল
একটি বিশাল ঘোড়ার সঙ্গে সাকার্সের একটি বড় বিশপ
কাঠের ক্রুশধারী একজন টিকিট কালেক্টারের সঙ্গে বাসের একজন ধর্মগান গায়ক
এক ভয়ংকর শল্যচিকিৎসকের সঙ্গে একটি দাঁতের শিশুডাক্তার
আর ঝিনুকদের সেনাপতির সঙ্গে জেসুইট সাঁড়াশী।

[দ্বিতীয় কবিতাটিতে শোভাযাত্রার নানান ধরনের মানুষের চরিত্রের অসঙ্গতি প্রেভের বর্ণনা করেছেন বিপরীতার্থক শব্দ সমাবেশে। বর্ণিত চরিত্রগুলি দেখেই কাদের ওপর প্রেভেরের রাগ—স্পষ্ট বুঝতে পারা যায়। বিশেষণগুলি দ্রুত উলটে দিয়ে যে কৌতুকের সমাবেশ করেছেন—তার স্বাদ কোনো ভাষাতেই অনুবাদে পুরোপুরি পাওয়া সম্ভব নয়। যেমন, চতুর্থ লাইনে আমি যে 'বোকা হাঁস' বসিয়েছি—ওটার মূল শব্দ, Dindon, যার অর্থ টার্কি অর্থাৎ মুর্গী জাতীয় সুখাদ্য পাখি। কিন্তু, ওর আর একটাও মানে হয়, বোকাসোকা লোক। ইংরেজীতেও যেমন 'গুজ' শব্দের অন্য মানে আছে—হি ইজ এ থরো গুজ! কিন্তু বাংলায় মুর্গী-হাঁসের বোকামি প্রসিদ্ধ নয়। আবার পঞ্চম লাইনের 'চশমা পরা কারখানা' কিছুই প্রায় বোঝায় না কারখানার মূল শব্দ Moulin, যার অর্থ মিল বা কারখানা—যেমন আটা-ময়দার কারখানা, কফি গুঁড়োবার কারখানা। প্যারিসের বিখ্যাত নাইটক্লাব মূল্যাঁ রুঝ—তার ওই নামের কারণ, ওই লাল বাড়িটাকে দেখতেই একটা উইণ্ড মিলের মতন। কিন্তু, মূল্যাঁ কথাটার আর একটা মানে আছে ফরাসীতে, মূল্যাঁ আপারোল মানে হচ্ছে বক্‌বকানি মেয়ে। তা হলে চশমাটা কি সুন্দর মানিয়ে যাচ্ছে!

বাহুল্যভয়ে আর দৃষ্টান্ত বাড়াচ্ছি না। কিন্তু এ ধরনের কবিতা বাংলায় লেখা হয় না বলেই, কিছুটা হয়তো স্বাদ পাওয়া যাবে ভেবে এ কবিতা অনুবাদে উদ্ধার করেছি।]

রেনে শার

[সুররিয়ালিস্ট আন্দোলনে যাঁরা প্রত্যক্ষভাবে অংশ নিয়েছিলেন, রেনে শার তাঁদের মধ্যে কনিষ্ঠতম। জন্ম, ১৯০৭, যখন বাইশ বছর বয়েস, তখন থেকেই প্রবলভাবেই মেতে উঠেছিলেন ঐ সাহিত্য আন্দোলনে, যুক্ত ছিলেন ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত, তারপর এসে গেল যুদ্ধ। সুররিয়ালিস্ট দলের যে অংশ সাম্যবাদ গ্রহণ করে, তিনি তাঁদের সমর্থন করেননি, কিন্তু যুদ্ধের সময় সাহিত্য-আন্দোলনের চেয়েও বড় কাজে আত্মনিয়োগ করলেন, দেশরক্ষায়। শার-এর খ্যাতির অনেকখানি অংশই—যুদ্ধের সময় প্রতিরোধ আন্দোলনে তাঁর অসমসাহসিকতার জন্য, জীবনপণ করে তিনি দেশরক্ষায় নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন, তিনি একজন জাতীয় বীর হিসেবে স্বীকৃত। এবং অনেকটা এই কারণেই, খাঁটি কবি হিসেবে শার-এর স্থান অত্যন্ত উঁচুতে। এই উক্তির মধ্যে বৈপরীত্যের সুর থাকলেও—শার নিজের শরীর এবং জীবন পর্যন্ত দান করতে প্রস্তুত ছিলেন দেশরক্ষায়, কিন্তু কবিতার পবিত্রতা ও শুদ্ধতার প্রতি তাঁর নিষ্ঠা ছিল অবিচল। কবিতাকে কখনও উদ্দেশ্যমূলক করেননি। অর্থাৎ আরাগঁ প্রভৃতির মতো যুদ্ধের সময়েও চিৎকারময় কবিতা লেখেননি। শার-এর সংক্ষিপ্ত, ঘন কবিতাগুলি চিরায়তের নির্যাস, সেই জন্যই দুরূহ, যে-কোনো ঘটনা বা চরিত্রই তাঁর কবিতার উপজীব্য নয়। সুররিয়ালিস্টদের অপর দুর্দান্ত প্রবক্তা আন্টোনিন আর্তো-র যেমন মত ছিল, কবির সঙ্গে এই বাস্তব জীবনের কোনো সম্পর্কই নেই, তাঁর দেশ-কাল-সমাজ কোনো কিছুর সঙ্গেই যোগ নেই—শার এ কথা মানতেন না, তাঁর মতে জীবনে ও বেঁচে থাকায় কবি তাঁর দেশ ও সমাজের সঙ্গে জড়িত, দায়িত্বশীল, কিন্তু কবিতা তাঁর ব্যক্তিগত আরাধনা, নিজস্ব মন্ত্রোচ্চারণ। কামু-র মতে শার এই শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ ফরাসী কবি।

শার এখন বছরের কিছুদিন প্যারিসে, কিছুদিন জন্মস্থান লিল-সুর-সরগ্ নামের দ্বীপে থাকেন। মিরো, ব্রাক্ প্রভৃতি শিল্পীদের সম্বন্ধেও লিখেছেন।]

ওরিওল পাখি

ওরিওল পাখি ছুঁয়েছে উষার রাজধানী
তার সঙ্গীত তলোয়ার, এসে বন্ধ করেছে দুঃখ শয্যা
সব কিছু আজ চিরজীবনের শেষ। (৩রা ডিসেম্বর ১৯৩৯)

বিরুদ্ধতা

তোমার শুকরদের মান্য করো, যাদের অস্তিত্ব আছে। আমি আত্মসমর্পণ করি
আমার দেবতাদের কাছে, যার অস্তিত্ব নেই।
আমরা নির্দয় মানুষ থেকে যাই।

তুমি ছেড়ে গিয়ে ভালোই করেছো, আর্তুর র‍্যাঁবো

তুমি ছেড়ে গিয়ে ভালোই করেছো, আর্তুর র‍্যাঁবো। বন্ধু ও শত্রুদের প্রতি সমানভাবে তোমার আঠারো বছরের অবহেলা, প্যারিসের কবিদের ন্যাকামির প্রতি, আর সেই বন্ধ্যা ঝিঁঝির একঘেয়ে সুর—তোমার গ্রাম্য ও পাগলাটে পরিবার—তুমি ভালো করেছো তাদের উদার বাতাসে ছড়িয়ে দিয়ে, তাদের অহংকারী গিলোটিনের খাঁড়ার নীচে পেতে। তুমি বেশ করেছো, ছেড়ে চলে গেছ অলসদের রাস্তা, লিরিক-প্রস্রাবকারীদের সরাইখানা—পশুর নরকস্থানের জন্য, প্রতারকদের ব্যবসা এবং সরল মানুষের অভ্যর্থনা।

শরীর ও আত্মার সেই দুর্বোধ্য উত্থান, লক্ষ্যস্থানে আঘাত করার সময় ফেটে যায় যে কামানের গোলা, হ্যাঁ, নিশ্চিন্ত, তাই তো মানুষের জীবন! শৈশব থেকে উঠে এসে আমরা আমাদের প্রতিবেশীদের অনির্দিষ্টকাল হত্যা করতে পারি না। কী হয়, যদি ক্বচিৎ জেগে ওঠা আগ্নেয়গিরি থেকে লাভা বেরিয়ে ছড়িয়ে যায় বিশ্বের বিশাল শূন্যতায়, আনে সেই গুণাবলী যারা নিজের ক্ষতস্থানের গান করবে।

তুমি ছেড়ে চলে গিয়ে ভালো করেছো, আর্তুর র‍্যাঁবো। আমাদের কাছে তোমার প্রমাণ করার দরকার নেই, আমরা অল্প কয়েকজন বিশ্বাসী, যে তোমার পক্ষেও সুখ সম্ভব ছিল।

[মালার্মের পর, শার-এর কবিতাই ফরাসীতে সবচেয়ে কঠিনবোধ্য, অধিকাংশ কবিতারই স্পষ্ট, সরল, নির্গলিতার্থ করা সম্ভব নয়, নানারকম ব্যাখ্যা নিয়েও অনেক সমালোচকের মধ্যে মতভেদ আছে। কবিতায় দুর্বোধ্যতার যাঁরা বিরুদ্ধে, তাঁদের কাছে আগেই স্বীকার করা হয়তো যায় যে, শার-এর কোনো কবিতারই সম্পূর্ণ অর্থ নেই। অর্থাৎ, তিনি তাঁর আবেগ বা বিশেষ অনুভূতি কবিতায় সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করেন না, মাত্র যাত্রারম্ভটুকু। যাতে পাঠকের আত্মা ক্রমশ সেই

আরম্ভটুকু অবলম্বন করে, নিজস্ব বিভিন্ন ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় মগ্ন হতে পারে। তাঁর কোনো বর্ণনাই ছবি নয়, সুরের মতো। বলা বাহুল্য, এই সুরের স্পর্শ একমাত্র পাওয়া যেতে পারে কবির নিজ নির্বাচিত মূল ভাষায় অনুবাদে শুধু প্রকরণের আভাস—তাও কম নয়, আমাদের পক্ষ অন্যরকম, নতুন।

'ওরিওল' কবিতার মর্মের সূত্র পাওয়া যাবে, রচনার তারিখে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রথম দিক। ইওরোপের কালো আকাশ পেরিয়ে এলো একটি পাখি। 'ওরিওল' কথাটার মানে সোনালী পাখি, হলদে আর কালোয় মেশানো যে পাখি প্রায় সর্বত্র দেখা যায়—তার নাম, আমাদের দেশে যে হলুদে পাখিগুলো 'গৃহস্থের খোকা হোক' বলে ডাকে—অনেকটা সেই রকম।

র‍্যাঁবো-র উদ্দেশে কবিতাটি নিশ্চিত অপেক্ষাকৃত সরল। বিশ্ববিজয়ী কবি র‍্যাঁবো মাত্র ১৯ বছর বয়সে (মতান্তর আছে) কবিতা লেখা শেষ করে, জীবনের যে বাকি আঠারো বছর সাহিত্য ও সাহিত্যিক বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে সম্পূর্ণ সম্পর্কচ্ছেদ করে আফ্রিকার ভয়ংকর জঙ্গলে আদিবাসীদের মধ্যে চোরাই বন্দুকের ব্যবসা করে কাটিয়েছেন, শার র‍্যাঁবো-র জীবনের সেই দ্বিতীয় অংশকেই সমর্থন করছেন। এই সমর্থনের কারণ বোঝা যায়। প্রত্যেক কবিই চায়, এক হিসেবে কবিতা লেখার হাত থেকে মুক্তি পেতে।]

রেনে গী কাদু

[রেনে কাদুকে আজকাল অনেকেই ভুলতে শুরু করেছেন। জীবনে অসফল এই কবি, ব্যর্থ, ভগ্নহৃদয়—রাজধানী থেকে দূরেই কাটিয়েছেন সারা জীবন। 'সারা জীবন' শব্দটা শুনলেই খুব দীর্ঘ মনে হয়, কিন্তু রেনে কাদু-র জীবন মাত্র একত্রিশ বছরের, জন্ম ১৯২০, মৃত্যু ১৯৫১। জন্মেছিলেন ব্রিটানিতে, বাবা স্কুল মাস্টার, সাধারণ পরিবার। আমরা আগে দেখেছি, অন্যান্য ফরাসী কবিরা প্রায় সকলেই নানা দেশ ঘুরেছেন, বহু অভিজ্ঞতা, বহু নাটকীয় ঘটনা জীবনে। রেনে কাদু-র জীবন একরঙা। ভ্রমণের সুযোগ হয়নি, বাকালরিয়া—অর্থাৎ বি. এ. পরীক্ষায় ফেল করেছিলেন বলে, বড় চাকরি পাননি কখনো, প্রাইমারি স্কুলে শিক্ষকতা করেছেন।

কবিতার বিষয়বস্তু যাই হোক, আজকাল দেখা যায়, সারা পৃথিবীতেই কবিরা নগরবাসী, অথবা রাজধানী-নিবাসী। হপকিন্সের উদাহরণ নিতান্তই ব্যতিক্রম। বাংলা কবিতার কেন্দ্র যেমন কলকাতা শহর। খ্যাতি প্রতিষ্ঠা কিংবা বার্ধক্যে ধর্ম-আশ্রয় কিংবা পল্লীনিবাসে নির্জন বিশ্রামসুখ কখনো কবিদের প্রিয় হলেও যৌবনে রাজধানী বা বড় শহরের পরিবেশ, যেখান থেকে নানান পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে, নতুন বই, নানান্ কবিদের আড্ডাস্থল—সব কবিদেরই আকর্ষণ। কবিতার ভাষা বা রীতি প্রায় দু'মাসে-ছ'মাসে বদলে যায় বলে, একমাত্র রাজনীতিতেই তার সংস্পর্শে থেকে কবিরা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য অর্জনের পথ প্রস্তুত করার চেষ্টা করেন।

আধুনিক কবিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ও বিশিষ্ট হয়েও, রেনে কাদু প্যারিসে এসেছেন মাত্র একবার। জীবন কাটিয়েছেন কর্মস্থল গ্রামাঞ্চলেই। সেই ছায়াময়, শান্ত পরিবেশ তাঁর কবিতায় নতুন সুর ও সরলতা এনে দিয়েছে। তাঁর জন্মস্থান ব্রিটানি বড় স্নিগ্ধ, মনোরম ভূমি। ব্রিটানির সৌন্দর্য ভুবনবিদিত। অনেকেরই নিশ্চয়ই মনে আছে, ফ্রান্স থেকে বহু দূরে তাহিতি দ্বীপে থেকে পল গগ্যাঁ জীবনের যে শেষ ছবিটি আঁকার চেষ্টা করেছিলেন, তার নাম 'ব্রিটানির তুষার'।]

কবির ঘর

যে দৈবাৎ ঢুকে পড়ে কবির নিজস্ব ঘরে, সে জানে না
এ ঘরের প্রতিটি আসবাব তাকে যাদু করতে পারে
চেয়ার আলমারির কাঠে সব ক'টি গ্রন্থি ধরে রাখে
যত বিহঙ্গের গান অরণ্যের বুকে আছে, তারও বেশী।
হঠাৎ টেবিল ল্যাম্প—মেয়েদের মতো তার গ্রীবার ভঙ্গিমা
মসৃণ দেয়াল থেকে উঁকি দিতে পারে কোনো পড়ন্ত সন্ধ্যায়
চকিতে সে দেবে ডাক নানা বর্ণ নানা জাতি মৌমাছির ঝাঁক।
ফুটন্ত ফুলের গুচ্ছে তাজা পাঁউরুটির গন্ধ সে পারে জাগাতে।
কেননা, এই যে এত নির্জনতা এই ঘরে, তার এত শক্তি
একটি বিস্তৃত হাত অন্যমনে সামান্য আদর করে যদি
এই মূক, অন্ধকার, শান্ত, হিম প্রত্যেকটি বিশাল আসবাবে
জেগে ওঠে—ভোরের আলোয় অমলিন সরল বৃক্ষের চঞ্চলতা।

হেলেনের প্রতি প্রেমের কবিতা

যেমন নদীর শুরু হয়
আপন গতিকে ভালোবেসে
নিজেকে একদা তুমি দ্যাখো
আমার দু' হাতে নগ্ন দেহে

আমি আর কিছুই ভাবিনি
চেয়েছি পাতায় ঢেকে দিতে
তোমার ও শরীরের শীত
আমার দু হাত বৃক্ষ পাতা

শরীরের প্রাণোচ্ছল জল
তার চেয়ে কত বেশী আর
আছে ভালোবাসার আমার,
নারীর শরীর এক পলক
আমার আঙুলে দোল খায়

এমন কি সাধ্য ছিল বলো
শুধু একবার চেয়ে দেখা

তোমার ও মর্মর শরীর—
সেই চেয়ে দেখা এক পলক
নিতান্তই পাবার বাসনা ?

কুমারী, উত্তর দাও তুমি
যে বাক্য অশ্রুত অন্ধকার
আমার হৃদয় মৃদু ঝোঁকে
চাপ দেয় তোমার হৃদয়ে

যদি দেখি কখনো তোমার
রূপান্তরে কোনো অস্থিরতা
তবে সেই অস্থিরতা এই :
তোমাকে প্রেমের আগে আমি
তোমার প্রেমকে ভালোবাসি ।

[হেলেন-কে ফরাসীরা উচ্চারণ করে এলেন । বা, ফরাসীদের না চটিয়ে বলা যায়, এলেনকে ইংরেজরা উচ্চারণ করে হেলেন । যাই হোক, এলেনের বদলে হেলেন-ই সেই ট্রয়ের আমল থেকে পরিচিত । হেলেন একটি সত্যিকার মেয়ের নাম, রেনে কাদুর সঙ্গে মেয়েটির দেখা হয় ১৯৪৩-এ, মৃত্যুর আগে বাকি কয়েক বছরে লেখা হেলেনের প্রতি প্রেমের কবিতাবলীই কাদুর শ্রেষ্ঠ রচনা, এবং এগুলি ফরাসী কবিতায় একটি অন্যরকম সরল ধারার সূচনা হিসেবে স্বীকৃত ।]

ইভ বন্‌ফোয়া

[আমাদের দেশে কবিতার যেমন কোনো ঐতিহ্য গড়ে ওঠেনি, কবিতা বা কবিদের নিয়ে কোনো নিষ্ঠাপূর্ণ আলোচনা আজও শুরু হল না । একটি দেশের কবিতা একটি খরস্রোতা নদীর মতো, এক-একজন বড় কবি এক-একটি গঞ্জ বা বন্দর । মূল কবিতার স্রোত থেকে কোনো কবিকেই সম্পূর্ণ আলাদা করে ছিনিয়ে এনে আলোচনা করা যায় না । আমাদের কোনো জীবিত বাঙালী কবি সম্পর্কে যদি বলা হয়, তিনি মুকুন্দরাম বা বিহারীলাল চক্রবর্তীর ধারার কবি, তবে সেই কবি নিজে তো বটেই, সমালোচকরাও আঁতকে উঠবেন । অথচ, এ রকমভাবে যোগাযোগ টেনে নবীন কবির কোথায় বিশেষত্ব না দেখালে কবিতার আলোচনা সম্পূর্ণ হতে পারে না । বরং, সাম্প্রতিক সমালোচকদের মতে, সাম্প্রতিক বাংলা কবিতা দেশের সঙ্গে যোগাযোগহীন, বিদেশ-নির্ভর, কৃত্রিম । কিন্তু, সহজ বুদ্ধিতেই বোঝা যায়, এ ব্যাপার অসম্ভব । কবিতার এক হিসেবে স্বদেশ-বিদেশ নেই । আবার, অন্য দিকে কবি যে ভাষায় লিখছেন, সেই ভাষার পূর্বাপর স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া যে-কোনো কবির পক্ষে অবাস্তবভাবেই অসম্ভব, শারীরিক অসামর্থ্যের মতই । শুধু চিন্তাধারা নয়, ভাষা ব্যবহারও কবিতা ।

এ প্রসঙ্গ মনে এলো, কারণ, বন্‌ফোয়া, যাঁকে দ্বিতীয় যুদ্ধোত্তর ফরাসী দেশের সবচেয়ে শক্তিমান কবি বলা হয়, সমালোচকরা তাঁর কবি-চরিত্রের সূত্র পেয়েছেন ভালেরির কবিতায়, এমনকি বহু যুগ পিছিয়ে ষোড়শ শতাব্দীর কবি মরিস সেভ-এর রচনায় । পূর্বে আলোচিত কবিদের

মধ্যে কক্‌তো'র সঙ্গে যেমন সমালোচকরা দেখেছেন মালহার্ব বা বঁসারের মিল, দেনো'র সঙ্গে নের্ভালের, এমনকি আপোলীনেয়ার—যিনি নবীন কবিদের রাজা, তাঁরও সঙ্গে পনেরো শতকের ডাকাত-কবি ফ্রাঁসোয়া ভিঁয়ো'র (অথবা ভিঁলো, দুরকমই উচ্চারণ হয় শুনেছি) কবিতার মিল ! মিল ঠিক নয়, দূর-সম্পর্কের উত্তরাধিকার ।

বন্‌ফোয়া'র জন্ম ১৯২৩-এ। গণিত এবং দর্শন অধ্যয়ন করেছেন। মধ্যযুগীয় শিল্প-স্থাপত্য-ভাস্কর্যে উৎসাহী। ফরাসীতে শেক্‌সপীয়র অনুবাদ করেছেন। এখন অধ্যাপনা করেন এবং শিল্প ও কবিতা বিষয়ে প্রবন্ধ লেখেন।]

সত্য নাম

দুর্গ. একদা যা ছিলে তুমি, তোমাকে ডেকেছি মরুভূমি
এই কণ্ঠস্বর আমি নাম রাখি রাত্রি : এই মুখ অনাগত ;
এবং যখন তুমি ঝরে যাও বন্ধ্যা মৃত্তিকায়
যে বিদ্যুন্মালাখানি তোমাকে এনেছে এই দেশে, সে নাম শূন্যতা ।

মৃত্যু, এক তোমার অতীতপ্রিয় দেশ, আমি আসি
শুধুই অনন্তকাল তোমার আঁধারময় পথে ।
আমি ধ্বংস করি স্মৃতি, তোমার বাসনা, দেহরূপ
আমি তো তোমার শত্রু, ক্রমশই অতীব নির্দয় ।

তোমার নতুন নাম যুদ্ধ রাখি, নিজ হাতে তুলে
তোমার শরীরে দেবো যুদ্ধের সমস্ত নিষ্ঠুরতা, অধিকার
করে নেবো এই হাতে, তোমার মুখের রেখা, ছিন্নভিন্ন, ম্লান
আমার হৃদয়ে এই দেশ—ঝড়ের আভায় আলোকিত ।

সারা রাত

সারাটা রাত ধরে পশুটা ঘোরে ঘরে,
এ পথ কি রকম, ফুরোতে রাজী নয় ?
সারাটা রাত ধরে হরিণ খোঁজে তীর,
কারা সে অনাগত, ফিরতে চায় আজ ?
সারাটা রাত ধরে ছুরিটা ক্ষত খোঁড়ে,
এ কোন্ জ্বালা যার পাবার কিছু নেই ?
সারাটা রাত ধরে রক্তমাখা দেহে পশুটা গুমড়োয়
ঘরের আলোটুকু অস্বীকার করে,
এ কোন্ মৃত্যু যে কিছুই সারাবে না ?

কবিতার শিল্প

রাত্রি থেকে বাইরে আসে রেণুমাখা চোখ
হাত দুটি শুষ্ক, অচঞ্চল
জ্বর নির্বাপিত, হৃদয়কে বলা হল
শুধুই হৃদয় হতে। শিরা-ধমনীতে ছিল একটি দানব
গর্জনের সঙ্গে পালিয়েছে।
মুখের ভিতরে ছিল একটি হতাশাময়, রক্তমাখা স্বর
অবগাহনের পর হয়েছে উদ্ধার।

[প্রথমেই স্বীকার করি, বন্‌ফোয়া'র 'সৌন্দর্য' নামে যে কবিতাটি আমার সবচেয়ে প্রিয়, সেটি অনুবাদের চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছি। আশা করি, অন্য কেউ করবেন। বন্‌ফোয়া শুদ্ধরসের কবি, ধ্যানময়। তাঁর রচনাশৈলী কঠিন, শব্দ অতিশয় নির্বাচিত। মৃত্যু এবং রাত্রি—এই দু'টি বিষয় তাঁর অধিকাংশ কবিতায় ছায়া ফেলে আছে। যদিও তাঁর কবিতা নৈরাশ্যের নয়। মৃত্যুর উপস্থিতিতে যে জীবন আলোকিত, বন্‌ফোয়া সেই জীবনের স্তোত্রপাঠক। এখানে মৃত্যু বলতে সামগ্রিক মৃত্যু হয়তো, ক্ষীণভাবে পরমাণু বোমার কথাও উল্লেখ করা যায়। এ কথা তো আমরা সবাই জানি যে আমেরিকানরা জাপানের হিরোসিমায় বোমা ফেলেছে, কিন্তু তার প্রভাব ও দুশ্চিন্তা সবচেয়ে বেশী ভোগ করেছেন ফরাসী লেখকরা—পীয়ের ইমানুয়েল নামে অপর একজন আধুনিক ফরাসী কবি বলেছেন, 'আমরা সবাই হিরোসিমার শিশু'।

'সারা রাত' কবিতাটিকে যেমন অধিকার করে আছে রাত্রি—সেই রকম, পশু, হরিণের ব্যাকুল ডাক, ছুরি—সবই মৃত্যুর প্রতীক, কিন্তু এই রাত্রি ও মৃত্যু কিছুই রূপান্তরিত করতে পারে না, কবি মোটেই বিচলিত না হয়ে তাঁর নিজস্ব নির্লিপ্ত সৌন্দর্য ভোগ করছেন। বন্‌ফোয়ারের কোনো কবিতাই বিচ্ছিন্ন নয়, বোদলেয়ারের 'অশিব পুষ্প' বা প্যার্সের কবিতাবলীর মতোই, তাঁর প্রায় সব কবিতাই ধারাবাহিক অনুভূতি।]

পিলিপ জাকোতে

[এবার আমরা এসে পড়েছি ফরাসী কবিতার সমসাময়িক কবিদের মধ্যে। পাঠক লক্ষ্য করুন, সমসাময়িক বাঙালী কবিদের সঙ্গে এঁদের কতখানি মিল বা প্রভেদ। পিলিপ জাকোতের জন্ম ১৯২৫-এ, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, মণীন্দ্র রায়, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, অরুণকুমার সরকার, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, নরেশ গুহ প্রমুখদের কাছাকাছি বয়সের ফরাসী কবি বন্‌ফোয়া, জাকোতে, আঁদ্রে দু বুশে, রেনে কাদু, জাক দুপ্যাঁ প্রভৃতি। ওঁদের কিছু কিছু কবিতা আলোচনা করলে, বাংলা কবিতা বিষয়ে আমাদের কিছুটা হীনমন্যতা কেটে যাবে।

প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু-দের কল্লোলের বিপ্লবের সময়েই এই দুর্নাম ওঠে যে, আধুনিক বাংলা কবিতার বিষয় বিদেশীদের কাছ থেকে ধার করা। রবীন্দ্রনাথকেও এই দুর্নাম সইতে হয়েছিল কিছুটা। সমালোচকদের এ মনোভাবকে নিশ্চিত হীনমন্যতা বলবো। বাংলা কবিতা পৃথিবীর যে-কোনো ভাষার কবিতার তুলনায় পশ্চাৎপদ নয়, বরং মনে হয় অগ্রবর্তী, বিদেশের কাছ থেকে গ্রহণ করার কিছু থাকলেও অনুকরণ করার কোনোই প্রয়োজন নেই। বরং, বাংলা কবিতার সুপ্রচার হলে, বিদেশী কবিরাও আমাদের থেকে অনেক কিছু গ্রহণ করতো। কিছু কিছু যে এখন

করছে, তা-ও ঠিক।

এখন দেখতে পাচ্ছি, কবিরা অনেক সাধারণ মানুষ হয়ে এসেছেন। এতদিন পর্যন্ত কবিদের একটা মঞ্চ দরকার হতো, সাধারণ মানুষের থেকে অনেক উঁচুতে দাঁড়িয়ে তাঁকে কথা বলতে হতো। —এমন রটনা ছিল যে, কবি একজন দুর্লভ-জন্মা, সে প্রবক্তা, মুক্তিদাতা। বিচারক যেমন আদালতের বাইরে একজন সাধারণ মানুষ, অন্য সকলেরই মতো চেহারা, এমন কি আসামীর মতোই—কিন্তু বিচারের সময় কেন যেন তাঁকে সাধারণ থাকলে চলে না, তাঁকে বসতে হয় উচ্চাসনে, মাথায় পরে নিতে হয় সাদা পরচুলা—তেমনি কবির উপরেও অসাধারণত্বের পোশাক চাপানো ছিল—এই শতাব্দীর প্রথম দিক পর্যন্ত। এখন লম্বা চুল, কাঁধে-চাদরের রূপ খুলে ফেলে কবি মিশে গেছে সাধারণ মানুষের মধ্যে, বা লুকিয়েছে। তার ব্যবহৃত শব্দ আর পাঁচজনের মুখের ভাষা, তার বিষয় তার নিজের জীবন। জাকোতে-ও এই আধুনিক জগতের কবি। তাঁর ব্যবহৃত ছবি কোনো বৃহতের বা অলৌকিকের আভাস আনে না, নিজের জীবনকেই উদ্ভাসিত করে।

জাকোতের জন্ম সুইটসারল্যানডে। লুসান বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনো করার পর, এখন সমালোচকের কাজ করেন। হোমার এবং জার্মান ঔপন্যাসিক মুজিলের অনুবাদ করেছেন।]

আমাদের এ জীবনে যেহেতু এসেছি আমি

আমাদের এ জীবনে যেহেতু এসেছি আমি এক আগন্তুক
শুধুই তোমার সঙ্গে কথা বলি অজানা ভাষায়,
কেননা তুমিই বুঝি হতে পারো একমাত্র আমার স্বদেশ,
আমার বসন্ত, টুকরো খড়কুটোর বাসা, বৃষ্টিপাত বৃক্ষশাখে

সকালের আলো ভেঙে কেঁপেছে আমার এই জলের মৌচাক
জায়মান রাত্রির-মাধুর্য......(যদিও জেনেছি আমি এই তো সময়
সুখময় দেহগুলি আলিঙ্গন করে তাকে প্রেমের আশ্লেষে,
তৃপ্তির শীৎকার ওঠে—কোনো একটি কৃশাঙ্গ তরুণী

বিরলে রোদন করে শীতের উঠোনে। আর তুমি ? তুমি নেই
এ শহরে, তুমি তো যাও না হেঁটে রাত্রির সম্মুখে দেখা দিতে ;
এই তো সময়, যখন নির্জন আমি, অদুষ্কর শব্দের বন্ধনে

একটি বাস্তব মুখ মনে আনি......) হে সুপক্ক ফল,
সোনালী পথের উৎস, আইভি উদ্যান—আমি শুধু তোমাকেই
ডাকি, তোমাকেই বলি, হে আমার অনাগত, নিজস্ব পৃথিবী...

অভ্যন্তর

এই সেই জায়গা, আমি চেষ্টা করছি জীবন কাটাতে
এই আমার ঘর, আমি ভালোবাসবার ভান করি
এই টেবিল, যাবতীয় জড়বস্তু ;—একটি জানালা
প্রতিটি আঁধার থেকে ঠেলে আনে সবুজ সীমানা।
হৃৎস্পন্দনের মতো কোকিলের ডাক ওঠে ঘন আইভি-ঝোপে
ভোরের প্রথম আলো হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ে
পলাতক ছায়ার উপরে।
এই তো আমার ঘর, আমি এখানেই থাকবো, খুব চমৎকার
ভাবে মেনে নিতে রাজী আছি, দিনভরা বহু প্রতিশ্রুতি।
কিন্তু এই মাকড়শাটা বিছানার পায়ের ওপাশে
(এসেছে বাগান থেকে, মনে হয়) অবিরাম বুনে যাচ্ছে জাল—
বহু চেষ্টা করে আমি ঠিকমতো পিষে ফেলতে পারিনি ওটাকে,
এই জাল ঘিরে ফেলে, ঢাকে, স্বচ্ছ আমার অস্তিত্ব।

[জাকোতে যে-হেতু সমসাময়িক কবি, সুতরাং তাঁর কিছু নিন্দে শুরু করা যাক্ ! এই কবির এখনও সনেট লেখার দুর্বলতা আছে। অথচ, পৃথিবীর প্রায় সমস্ত আধুনিক কবিই এখন সনেট লেখা অত্যন্ত কাঁচা-কাজ বলে মনে করেন, কারণ, কবিতাটি লেখার আগেই বা লিখতে লিখতে কবিকে যদি আঙ্গিক সম্বন্ধে সব সময় সজাগ থাকতে হয়, বা কবিতাটি ঠিক ক' লাইনে গিয়ে শেষ হবে মনে রাখতে হয়—তবে সেটা কবির নিশ্চিত পরাজয়। এই কৃত্রিমতা কবিরা আজকাল পরিহার করেছেন। জাকোতে-র এই দ্বিতীয় কবিতার শেষেও মাকড়শার জালের উল্লেখ খুব দুর্বল। জীবনের জটীলতা-ফটিলতা-বোঝাতে মাকড়শার জালের ছবি আঁকা খুবই পুরোনো হয়ে গেছে। সিনেমায় বা স্টেজে মাকড়শার জাল দেখানো এখনও খুব আধুনিকতা—কিন্তু বাংলা দেশের যে-কোনো সদ্য শুরু করা আধুনিক কবিও জানেন, ও জিনিস বহু-ব্যবহৃত, এখন পরিত্যাজ্য।

জাকোতে-র বিশেষত্ব, তাঁর কবিতায় সব সময় একটা অনুসন্ধান আছে—শব্দের মধ্য দিয়ে তিনি বারবার কবিতার একটা মূর্তি প্রতিষ্ঠা করতে চাইছেন, এবং সে মূর্তি কখনই সম্পূর্ণ হয় না। প্রথম কবিতায়, কবি একজন 'পরবাসী', তিনি নিজের প্রেয়সীকে খুঁজছেন, সেই সঙ্গে স্বদেশ, কারণ, বাসভূমি না পেলে প্রেয়সীকেও পাওয়া যাবে না। বারবার প্রেয়সী এবং স্বদেশের ছবি মিলে যাচ্ছে, কবির সন্দেহ, তাঁর ভাষা হয়তো তাঁর অনুসন্ধান ব্যক্ত করতে পারছে না।]

দু'জন নিগ্রো কবি

[ফরাসী দেশের বাইরে আগেকার ফরাসী উপনিবেশগুলিতে স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে যে কয়েকজন ফরাসী ভাষায় কবিতা লিখেছেন—তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দু'জন, এমে সেজার এবং লেওপোল্ড সেদার সেঙ্ঘর। এঁদের মধ্যে, এমে সেজারের কবিত্ব বহুজনস্বীকৃত, তিনি সুররিয়ালিস্ট কবিদের অন্যতম, এবং উল্লেখযোগ্য ফরাসী কবিদের সম্পর্কে আলোচনায় তাঁর নাম প্রায়ই দেখা যায় ; যদিও আশ্চর্যের বিষয়, বহু কবিতা সংকলনে তিনি অবহেলিত। সেঙ্ঘরের

কবিত্ববোধ খুব সূক্ষ্ম না হলেও, তিনিও যথেষ্ট বিখ্যাত এবং আফ্রিকার একটি নবীন রাষ্ট্রের তিনি রাষ্ট্রপতি এখন।

এককালের ভারতীয়দের কাছে বিলেতের মতো, ফরাসী উপনিবেশের প্রতিভাশালী তরুণরাও প্যারিসে লেখাপড়া শিখতে যেতেন। বর্ণ-বৈষম্যের বিষ এঁরাও সহ্য করেছেন। একটি ফলের ব্যবসায়ী ভালো ভালো মর্তমান কলার বিজ্ঞাপন দিয়ে প্যারিসের দেয়ালে দেয়ালে প্রায়ই পোস্টার লাগান। সেই পোস্টারের ছবিতে আছে, একটি নিগ্রো আহ্লাদের সঙ্গে কলা খাচ্ছে। কালো কুচকুচে চেহারার নিগ্রো হলদে রঙের পুরুষ্ট কলা মুখে দিয়ে আছে—ছবিটা হাস্য উদ্রেক করে। দুঃখিত সেঙ্ঘর যুবক বয়সে প্যারিসের পথে পথে ঘোরার সময় লিখেছিলেন, 'আমার ইচ্ছে করে প্যারিসের দেয়াল থেকে ঐ হাসিমাখা মুখগুলো উপড়ে নিতে!'

আমরা দু'জনের কবিতা অনুবাদ না করে, এমে সেজারকে লেখা সেঙ্ঘরের একটি কবিতা তুলে দিলাম। খাঁটি কবিতার আস্বাদ এতে হয়তো পাওয়া যাবে না—কিন্তু একজন সমসাময়িক কবির প্রতি অপর কবির এমন আন্তরিক আহ্বান ও শ্রদ্ধার চিহ্ন দুর্লভ। কবিতাটি খানিকটা অভিমানেরও। কবিতার সুউচ্চ স্বর্গ থেকে তিনি সেজারকে দেশের মাটিতে নেমে আসতে বলছেন।]

এমে সেজারকে চিঠি
লেওপোল্ড সেঙ্ঘর

প্রিয় ভ্রাতা এবং বন্ধুর প্রতি আমার সংক্ষিপ্ত এবং সহোদরপম শুভেচ্ছা
বোকা কালো মানুষের দল এবং দূর দূরান্ত পরিভ্রমণকারীরা তোমার প্রতি
মসলা সুগন্ধ এবং দক্ষিণের নদী ও দ্বীপের শব্দে ভরা
সমৃদ্ধ ভাষায় প্রশস্তি জানিয়েছে।
তোমার প্রশস্ত কপাল এবং তোমার সূক্ষ্ম ওষ্ঠের ফুলের প্রতি ওদের স্তুতি
তোমার শিষ্যদের জন্য শ্রদ্ধা এক মৌচাক স্তব্ধতা,
ময়ূরের বর্ণময় পাখা
চাঁদ ওঠার আগে পর্যন্ত যে তুমি ওদের উৎসাহকে তৃষ্ণাময়
এবং অতৃপ্ত রেখে দাও
সে কি তোমার রূপকথার ফলের মিষ্টি গন্ধ না দুপুরে
মাঠে হলকর্ষণের আলো ?
সাপাডিলার ছালপরা নারীরা তোমার আত্মার সেরালিও-তে
বসতি করে।

তোমার জীবন্ত জ্বলন্ত অঙ্গারে আমি সময় ছাড়িয়ে মুগ্ধ
ছাইমাখা চোখের পাতা ছাড়িয়ে—তোমার সঙ্গীতের প্রতি
আমাদের অতীত বছরের হাত ও শ্রদ্ধা বাড়িয়েছি
তুমি কি ভুলে গেছো তোমার মহত্ত্ব, তোমার কথা ছিল
পিতৃপুরুষ, রাজকুমারের দল ও ঈশ্বরের গান করা—

ফুল নয়, কুয়াশা নয়।
আমাদের আত্মায় তুমি এনে দেবে তোমার বাগানের সাদা ফুল
ফুল শুধু খাদ্য, ফসলের বৎসরেই ফুটেছে
তোমার নিশ্বাস সুগন্ধ করে নিতে তুমি তার একটি
পাপড়িও চুরি করবে না
অতীত ঘটনার কুণ্ড থেকে আমি তোমার মুখ স্পর্শ করি
তরুণ প্রণয়কে সতেজ করার জন্য আমি বসন্তকে ডাকি
তুমি রাজকীয় ভঙ্গিতে বসে আছো, একটি ছোট পাহাড়ে বাহুর ভর
তোমার শয্যার চাপে ভূমি ঈষৎ দুঃখিত।
জলে ডোবা জমিতে দুঃখিত ঢাকের বাজনা তোমার গান গায়
তোমার কবিতা রাত্রি এবং দূর সমুদ্রের নিশ্বাস।
তুমি সঙ্গীত ও ছন্দের নিখাদে আকাশ থেকে একটি তারা ছিঁড়ে আনবে
হতভাগ্য দরিদ্রেরা সারা বছরের উপার্জন দেবে তোমার পায়ে
তোমার নগ্ন পায়ের কাছে মেয়েরা ডালি দেবে তাদের রজন হৃৎপিণ্ড
দেখাবে পরাজিত আত্মার নাচ।

হে বন্ধু, তোমাকে ফিরতে হবে
আমি তোমার প্রতীক্ষায় থাকবো—কেইসড্রাট গাছের নিচে
জলপোতের অধিপতির কাছে আমি এই গোপন কথা বলেছি।
অনেক প্রতিশ্রুতি নিয়ে তুমি ফিরে আসবে। সূর্য ডুবে গেলে
ম্লান রাত্রি যখন ভর করে বাড়ির ছাদে
খেলোয়াড়েরা যখন বরের বেশে যৌবন দেখায়
সেই কি তোমার ফিরে আসার চিহ্ন ?

[সাপাডিলা এক ধরনের চিরহরিৎ বৃক্ষ, হল্‌দে-ছাই রঙা ফল হয়। সেরালিও (Seraglio), তুর্কি 'সেরাই' শব্দের সঙ্গে মিল আছে কিছুটা, বন্ধ ঘর—যেখানে কোনো মসুলমান তাঁর স্ত্রী বা রক্ষিতাকে আব্রুতে রাখেন। ছোট হারেম বলা যায়। কেইসড্রাট কি ধরনের গাছ আমি জানি না। আফ্রিকার কয়েকটি প্রবাদ বা উপকথারও উল্লেখ আছে—সেগুলো, আমার জানা নেই।]

ইতালির কবিতা : গোধূলি ও ভবিষ্যৎ

এই শতাব্দীর শুরুতে, ফরাসী কবিতায় যেমন যৌথ সম্রাট ছিলেন দুই দিকপাল, ভালেরি এবং ক্লোদেল—এবং পরে আপোলীনেয়ার এসে এবং সুররিয়ালিস্টদের বিদ্রোহ—ফরাসী কবিতায় নতুন ধারা এনে দেয়—সেইরকমই, ইতালির কবিতায় বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে পর্যন্ত স্তম্ভ ছিলেন তিনজন মহৎ কবি, কার্দুচ্চি, পাসকোলি এবং দানুৎসিয়ো—এঁদের প্রতিহত করে নবীন বিদ্রোহ শুরু হয় ইতালিতে। এই তিনজনকে বলা যায় রোমান্টিক যুগের শেষ অশ্বারোহী দীপ্ত, বর্ণাঢ্য পরিচ্ছদে ভূষিত মানুষকে এঁরা মহামানব করতে চেয়েছিলেন—এঁদের প্রভাব ধ্বংস করার জন্য নবীনরা কবিতায় নিয়ে এলেন একরঙা সাধারণ মানুষের কথা—যে মানুষ লাঞ্ছিত ও বিধ্বস্ত, আত্মগোপনকারী—এই যন্ত্র ও যুদ্ধের যুগে যে মানুষ অতি সাধারণ এবং অসহায়। এই নবীন আন্দোলনের নাম 'ভবিষ্যৎবাদ'—রোমান্টিকদের অতীতে-মুখ-ফেরানো স্বরূপের বিরুদ্ধে নবীনদের এই উত্তর। ইতালির কবিতার এই আন্দোলনের সঙ্গে সেই সময়ের ফরাসী কবিতার তেমন মিল নেই, কিন্তু ইংরেজি কবিতার সঙ্গে আছে। তুলনীয় সমসাময়িককালে টি. এস. এলিয়ট রচিত 'ফাঁপা মানুষ' কিংবা প্রুফকের উক্তি, 'আমি যুবরাজ হ্যামলেট নই, আমি তা হতেও চাইনি!' এই ভবিষ্যৎবাদের পরবর্তী আন্দোলনের নাম 'হারমেটিক' বা বলা যায় 'নিরুদ্ধ কবিতার' আন্দোলন—যে মতবাদে, একটি কবিতার মধ্যেই শেষ। যাই হোক, সে সম্পর্কে পরে আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু ইতালির 'ভবিষ্যৎবাদ' আন্দোলনের আগে, এই শতাব্দীর প্রথম দশকে আর একটি সংক্ষিপ্ত কিন্তু সার্থক আন্দোলন হয়েছিল, যার নাম দেওয়া হয়েছে 'গোধূলি কবিতা'। স্বল্পস্থায়ী হলেও সে আন্দোলন উল্লেখযোগ্য।

রোমান্টিকদের প্রতিনিধি যদি দানুৎসিয়োকে ধরা যায়, তবে, সেই বিশাল পুরুষের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল দুটি রোগাপটকা বাচ্চা ছেলে। নীৎসের শিষ্য দানুৎসিয়ো তাঁর গল্পে, নাটকে এবং কবিতার মধ্য দিয়ে প্রবলভাবে আশার জয়গান, বীরত্ব এবং রমণীসম্ভোগের কথা বলেছেন উজ্জ্বল ভাষায়, শব্দের ঝংকারে, ছন্দের চমৎকারিত্বে। তাঁর বিরুদ্ধে যারা দাঁড়ালো, তারা যেন নিষ্প্রাণতার প্রতীক—ম্লান, অলংকারহীন ভাষা, সাধারণ শব্দাবলী—ভাঙা দুর্গ, পরিত্যক্ত বাগান, ঘরের জানলা, দীর্ঘশ্বাস, হতাশা তাদের কবিতার বিষয়—প্রতি পদে জীবনের সমস্ত গৌরবকে অস্বীকার। 'গোধূলির কবি'দের মধ্যে যে দুজন প্রধান—সেই গুইদো গৎসানো আর সার্জও কোরাৎসিনি—দুজনেই মারা গেছেন টি. বি. রোগে, অল্প বয়সে। কোরাৎসিনি মারা গেছেন মাত্র একুশ বছরে—তবু সেই বালকই দানুৎসিয়ো প্রমুখ মহারথীদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে ইতালির কবিতাকে নতুন পথে অনেকখানি অগ্রসর করে দিয়ে গেল। গৎসানোরও মৃত্যু হয়েছে মাত্র তেত্রিশ বছর বয়সে।

'ক্রেপুসকোলারি' বা 'গোধূলির কবি'দের নব্যরীতির নিষ্প্রাণ, বর্ণহীন, নিরাশাময় ভাষা ও ভাবের ব্যাখ্যা খুব সহজেই করা যায়। পূর্ববর্তী প্রবল প্রভাবশালী লেখকদের বিরুদ্ধে নবীনরা যখন বিদ্রোহ করেন, তখন পূর্ববর্তীদের রচনায় যে সব উপাদান নেই, নবীনদের রচনায় অজ্ঞাতসারেই সেগুলি এসে যায়। ফলে, ভাষার অন্য একটি দিক খুলে যায়, উভয় দলের কাছ থেকে ভাষা ধনী হয়। রবীন্দ্রনাথের উচ্চ মহত্ত্ব এবং বিশ্বমানবতার বিরুদ্ধে যেমন জীবনানন্দের নির্জন আত্মকেন্দ্রিক মগ্নতা।

গুইদো গৎসানো

[গুইদো গৎসানোর জন্মসাল ১৮৮৩। ছেলেবেলা থেকেই যক্ষ্মারোগ। এই কবিতাটিতে দেখা যাচ্ছে পঁচিশ বছর বয়সেই যেন তাঁর যৌবন শেষ হয়ে গেছে। বার্ধক্যের ভয়ে কবি ভীত। যদিও, সে বার্ধক্য আসার আগেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু গুইদো বাঁচতে চেয়েছিলেন। যক্ষ্মা সারাবার জন্য কীটস এসেছিলেন ইতালিতে। আর ইতালির কবিরা যাবে কোথায়? গুইদো পৃথিবীর বহু দেশে আকুল হয়ে ঘুরেছেন রোগ সারাবার জন্য। তবু বাঁচতে পারেননি।]

সংলাপ

পঁচিশ বছর! বুড়ো হয়ে গেছি আমি
বুড়ো হয়ে গেছি! যৌবন গেছে শ্রেষ্ঠ ফসল লুকায়ে
পড়ে আছে শুধু শূন্যতা আর সংসার।

সময়ের পুঁথি গিয়েছে হারায়ে—সেখানে আমার শেষ
কান্নার স্বর চাপা পড়ে আছে, ধূসর পাণ্ডুলিপি
হয়তো আমারে চেনাতে পারিত অতীতের সেই ছন্দ।

পঁচিশ বছর! মনে মনে আমি করেছি আলিঙ্গন
পৌরাণিকের যত বিস্ময়—আমার আকাশ ম্লান,
একা বসে আমি দেখি সূর্যের ধীরভাবে ডুবে যাওয়া।

পঁচিশ বছর! তা হলে তিরিশও কেটে যাবে এই ভাবে
চুপিসাড়ে, শুধু কটু অনুভূতি মরণের সাথে জোড়া
ভয়ের শিহর, তাও চলে যাবে, আবার আসিবে চল্লিশ।

কি ভয়ংকর—চল্লিশ, সে যে ভীরু পরাজয়, আর
ম্লান মানুষের বিরস বয়স, তার পরে বুঝি বার্ধক্যের হানা
নকল দন্ত, কলপ মাখানো কেশরাজিভরা বৃদ্ধ বয়েস।

কভু পুরোপুরি-ভোগ না-করার হে আমার যৌবন ·
আজ দেখি আমি তোমার স্বরূপ, সত্যমূর্তি
দেখি তব হাসি, প্রেমিকের শোভা, যে শোভা মোদের

শুধু বিদায়ের বিষাদের কাল নির্দেশ করে।
পঁচিশ বছর ! যত দূরে আমি চলেছি অন্যপ্রান্তে
তত বলে যাই স্পষ্ট কণ্ঠে, হে আমার যৌবন

তোমার ও রূপ মধুর প্রেমের উপযোগী ছিল !

[এই কবিতাটির শুধু প্রথম অংশ আমি অনুবাদ করেছি, দ্বিতীয় অংশে আছে, এই যে যৌবন মধুর প্রেমের উপযোগী—এই যৌবন কবি নিজে কখনো ভোগ করতে পারেননি। যেন, তাঁর হয়ে অন্য একজন কেউ ভোগ করেছে আজীবন। সম্পূর্ণ কবিতাটি পড়তে কারুর ইচ্ছে হয়, তবে ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত 'কনটেমপোরারি ইটালিয়ান পোয়েট্রি' নামের দ্বি-ভাষা সংকলনটি দেখতে পারেন।

প্রথমত ইতালির কবিতা অনুবাদে আমি শুদ্ধ ক্রিয়াপদ ব্যবহার করেছি। ইতালির কবিতায় ওই রকম ব্যবহার করার উদ্দেশ্য, আমাদের বাংলার মতো ইতালিতেও এ শতাব্দীর গোড়া পর্যন্ত মুখের ভাষা আর লেখার ভাষার রীতি ছিল আলাদা। নবীন কবির দল এই হাস্যকর পার্থক্য ভেঙে দেন—কিন্তু গোড়ার দিকে সেই পরিবর্তনটুকু বোঝাবার জন্যই একটি কবিতায় সাধুভাষা প্রয়োগ করে রাখলুম।]

দিনো কামপানা

[প্যান্টের পিছন-পকেটে একটা কবিতার বই, হুইটম্যানের 'লীভস অব গ্রাস'—শুধু এই নিয়ে ইহুদী মায়ের ছেলে দিনো কামপনা কৈশোর বয়সেই বেরিয়ে পড়েছিলেন পৃথিবীতে, এই বিংশ শতাব্দী তখন সবে শুরু হয়েছে। কি খুঁজতে বেরিয়েছিলেন কে জানে, কিন্তু পেয়েছেন শুধু দারিদ্র্য, হতাশা আর মাথার অসুখ। কামপানা যেন ইতালীয় কবিতার র‍্যাঁবো—দেশ ছেড়ে ছন্নছাড়ার মতো ঘুরেছেন ইওরোপের সর্বত্র, দক্ষিণ আমেরিকায়। ছুরি-কাঁচি শান দেওয়ার চাকরি থেকে শুরু করে, ইঞ্জিনের কয়লা ঠেলা, লিফ্‌ট-ম্যানের কাজ, জাহাজের ডেক পরিষ্কার করা ইত্যাদি বহু জীবিকাই গ্রহণ করেছেন। তাও সুস্থ শরীরে নয়, যৌবনেই পাগলামির লক্ষণ দেখা যায়, সব মিলিয়ে সাত-আটবার পাগলাগারদে বন্দী হয়েছেন ও বেরিয়েছেন, ইতালী ও সুইটসারল্যাণ্ডে দু'বার জেলও খাটতে হয়েছে। লেখাপড়া শিখতে পারেননি, কিন্তু কামপানার কবিতায় বৈদগ্ধ্য অনুপস্থিত নয়।

প্রথম মহাযুদ্ধ আরম্ভ হবার বছরে, এলোমেলো বিশ্রীভাবে ছাপা কামপানার একটি চটি কবিতার বই 'অরফিউসের গান' ইতালির সাহিত্যে প্রবল আলোড়ন এনে দিল।

ওদিকে, ইতালির সাহিত্যে তখন চলছে প্রবীণদের বিরুদ্ধে নবীনদের বিদ্রোহ, 'ফিউচারইজম' আন্দোলন, একদল তরুণ লেখক বিশ্ব-সাহিত্যের তীর্থ প্যারিসে চলে গিয়ে সেখান থেকে বার করছে ইস্তাহার। ইতালির সাহিত্যকে তারা দেশের গণ্ডি ছাড়িয়ে ইওরোপীয় সাহিত্যের অঙ্গীভূত করে তুলছে। বিদ্রোহের প্রথম উচ্ছ্বাসে বহু উদ্‌ভট ও চোখ ঠিক্‌রোনো রীতিও দেখা দিচ্ছে। এদের মধ্যে প্রধান মেরিনেত্তি, নানা রকম মুখের আওয়াজ দিয়ে শব্দ বানাবার চেষ্টা করছেন ও ছন্দ

ভেঙে কবিতা সাজাবার কায়দায় কবিতায় নানা রকম চাক্ষুষ পরিবর্তন আনছেন। যদিও এজরা পাউণ্ড বলেছেন, 'ইতালিতে মেরিনেত্তি না থাকলে—ইংরেজীতে জয়েস, এলিয়ট ও আমি যে ধরনের পরিবর্তন আনার চেষ্টা করছিলুম তা সম্ভব হতো না'—কিন্তু শেষ পর্যন্ত মেরিনেত্তির কবিখ্যাতি সময়কে ছাড়িয়ে যেতে পারেনি। ইতালির প্রথম দুই দশকের যে কাব্য-আন্দোলন, তার মধ্যে দিনো কামপানাই সকলকে ছাড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছেন।

কামপানার জন্ম ১৮৮৫-তে। ১৯৩২-এ মাত্র ৪৭ বছর বয়েসে একটি উন্মাদ আশ্রমে তাঁর মৃত্যু। শেষ পর্যন্ত তাঁর কবিতা রোমান্টিক রসেরই কবিতা।

জেনোয়ার নারী

তুমি এনে দিলে সমুদ্র থেকে একমুঠো পানা
তোমার অলকে, রৌদ্র তাম্র শরীরে তোমার
প্রবাসী বাতাস নানা দেশ ঘুরে এনেছে বাসনা
আমার জন্য।
আহা, কি দেবীর
মতো সরলতা তোমার তন্বী শরীরের রূপে
ভালোবাসা নয়, নয় যন্ত্রণা, মায়াবী অতীন্দ্রিয়
ছায়া যেন এক অমোঘতা, ফেরে
তোমার শান্ত, ধ্রুব আত্মায়
ভেঙে মিশে যায় আনন্দে, যায় শান্ত অলৌকিক,
যেন তাকে ফের মরুর উষ্ণ ঝড়ে নিয়ে যাবে
দূরে অনন্ত শূন্য আকাশে।
তোমার মুঠোয় এই যে বিশ্ব কত ছোট, কত পলকা

উমবার্তো সাবা

[উমবার্তো সাবা এ শতাব্দীর ইতালীয় কবিতায় একক ব্যতিক্রম। জন্মেছেন মূল ইতালি থেকে অনেক দূরে, আড্রিয়াটিক সমুদ্রের ত্রিয়েস্ত দ্বীপে। ত্রিয়েস্ত ইতালি থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল বহুদিন, প্রথম মহাযুদ্ধের ফলাফল হিসেবে এই দ্বীপ ইতালির সঙ্গে রাজনৈতিকভাবে যুক্ত হয়। তখন সাবা-র বয়েস ৩৫। অর্থাৎ পূর্ণযৌবন পর্যন্ত তিনি ইতালির ভাষায় কবি হয়েও সে দেশের নাগরিক ছিলেন না।

কিন্তু উমবার্তো সাবা এ শতাব্দীর প্রধান তিনজন আধুনিক ইতালীয় কবির অন্যতম। উনগারেত্তি এবং মনতালের সঙ্গে তাঁর নামও সমান শ্রদ্ধেয় এবং ইতালির কবিতায় তাঁর প্রভাব অপরিমিত।

মূল ভূখণ্ড থেকে দূরে ছিলেন বলে, তিনি সমসাময়িক কাব্য আন্দোলনের খোঁজ পাননি। প্রত্যেক যুগেই কবিদের শব্দ ব্যবহারে এক ধরনের প্রবণতা দেখা যায়। শব্দ নির্বাচনে এক প্রকার রুচি এক যুগের কবিদের সময় চিহ্নিত করে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, বাংলায় আমরা

জন্মদাতাকে বাবা বলে ডাকি, কিন্তু শুদ্ধ 'পিতা' শব্দটি এখনও অপাঙ্‌ক্তেয় হয়ে যায়নি, অথবা মুখে বলি, বাড়িটা ভেঙে গেছে, লেখাতে 'ভগ্নস্তূপ' এখনও অচল নয়। কিন্তু, বাঁশীর বদলে কোনো অবাচীন কবিও 'হংসী'র সঙ্গে মেলাবার দারুণ লোভ সত্ত্বেও 'বংশী' ব্যবহার করবেন না ! কী সেই অলিখিত আইন—যাতে ভাঙার বদলে ভগ্নও চলে, কিন্তু বাঁশীর বদলে বংশী চলে না—তা ব্যাখ্যা করা যায় না। সময় অনুযায়ী এইরকম রুচি গড়ে ওঠে—সব কবিরাই তা টের পেয়ে যান।

মূল ভূখণ্ড থেকে দূরে সাবা এই ধরনের আধুনিক শব্দ ব্যবহারের রুচি টের পাননি। সুতরাং তিনি নিজস্ব শব্দ ব্যবহারের একটি রীতি প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং প্রধানত অনুসরণ করেছেন ক্লাসিক ধারা। সরলতা এবং প্রভূত কবিত্ববোধ তাঁর কবিতাকে বিশিষ্ট এবং স্বতন্ত্র করেছে।

১৮৮৩ সালে জন্ম, প্রায় সারা জীবনই দূরে কাটিয়ে, উমবার্তো সাবা-র মৃত্যু ১৯৫৩তে। }

নারী

যখন ছিলে ছোট্ট খুকুমণি
পারতে হুল ফোটাতে
কাঁটার ধার বুনো ফুলের মতো।

তোমার ঐ ছোট্ট পা দুখানি
ছিল কেমন বন্য, তুমি অস্ত্র হয়ে লাথি ছুঁড়তে—
তোমায় ধরা শক্ত ছিল, বিষম শক্ত।
আজও তেমন ছোট্ট আছো

অথচ সুন্দরী।
সময় আর দুঃখ দুই সুতোয় জট বাঁধা
তোমার আমার দুই হৃদয়—আজ হয়েছে এক
এখন তোমার ভ্রমর-কালো চুলের মধ্যে আমার হাত
এখন আর ভয় করি না তোমার ঐ ছোট্ট সাদা
খরগোশের মতন দুই ধারালো কান !

"সবুজ ফসল, ফল"

সবুজ ফসল, ফল, রূপসী রানীর মতো ঋতুর
বর্ণনা।
বেতের ঝুড়ির মধ্যে ঝলসে ওঠে মিষ্টি স্বাদ
দাঁত লোভী করে।

এক জোড়া তামাটে পা, নগ্ন হাঁটু—আসে, অহংকারী
বালকের—ফের দৌড়ে চলে যায়।

অন্ধকার

নেমে আসে সামান্য দোকানটিতে, গাঢ় হয়—
দ্রুত বুড়ো হয়ে যাওয়া মায়ের মুখের মতো।

সেই ছেলেটা

বাইরে রোদ্দুরে ছুটে যায়, লঘু পায়ে হাল্‌কা ছায়া
সঙ্গে সঙ্গে ফেরে।

[মূল কাব্যধারা কিছুটা বিচ্ছিন্ন থেকে সাবা যে প্রাচীনপন্থী হয়ে থাকেননি, কারণ, তাঁর অধিকাংশ রচনাই আত্মজীবনীমূলক। নিছক আকাশ, সমুদ্র ইত্যাদি প্রাকৃতিক সম্পদের স্তুতি বা মানুষের মহানুভবতার জয়গান না করে তিনি নিজের জীবনের ছোটখাটো সুখ-দুঃখের কথা লিখেছেন। 'গোধূলির কবিদের' মতো ভাষা ব্যবহারে লাঞ্ছিত এবং পরাজিত ভঙ্গি না থাকলেও, তিনি দূরে থেকে এবং না জেনে, মানসিকতায় সমসাময়িক 'গোধূলি কবিতা' আন্দোলনের কাছাকাছি ছিলেন এবং কবিত্বশক্তিতে ওঁদের চেয়ে অনেক বড়।]

জুসেপ্পে উনগারেত্তি

[যদিও বাবা-মা ইতালিয়ান, কিন্তু উনগারেত্তি জন্মেছিলেন মিশরে, এবং লেখাপড়া শিখেছেন প্যারিসের সোরবোন বিশ্ববিদ্যালয়ে। ভালেরি, জীদ, আপোলীনেয়ার প্রভৃতি সাহিত্যের বিখ্যাত মহীপালের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা ছিল, ফরাসী সাহিত্যের আবহাওয়ায় তাঁর মানস গড়ে ওঠে। কিন্তু ইতালিয়ান সাহিত্যে এক সময় তাঁর নিন্দে ও প্রশংসার প্রবল ঝড় ওঠে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে ইতালিতে তিনিই ছিলেন একক খ্যাতি-অখ্যাতির কেন্দ্র।

জন্ম ১৮৮৮, প্যারিসে লেখাপড়া শেষ করে ইতালিতে এলেন ১৯১৪ সালে। তখন যুদ্ধ। যুদ্ধে যোগ দিয়ে তিনি লড়াই করলেন ইতালি ও ফ্রান্সে। ট্রেঞ্চের মধ্যে বসে বসে কবিতা লিখতেন, তাঁর বন্ধু আপোলীনেয়ারও অন্য দিকের ট্রেঞ্চে বসে তাঁর বিখ্যাত কবিতাগুলি লিখছেন, সেই সময়।

যুদ্ধ থেকে ফিরে কবিতার বই ছাপলেন। সাংবাদিক বৃত্তি নিয়ে ঘুরলেন সমগ্র ইওরোপ, তারপর ইতালীয় ভাষার অধ্যাপক হিসেবে ব্রাজিল গিয়েছিলেন। দ্বিতীয় যুদ্ধ বাধার সময় তাঁকে জোর করে তাড়িয়ে দেওয়া হয় বাজিল থেকে। এখন রোমে অধ্যাপনা করছেন।

ইতালির কবিতায় হারমেটিক কবিতার যে আন্দোলন শুরু হয়, কিছু ফরাসী কবিও এই অভিধায় ভূষিত হচ্ছেন—উনগারেত্তিকে তার পুরোধা বলা যায়। হারমেটিক আন্দোলন সম্পর্কে সামান্য আলোচনা করা যেতে পারে। হারমেটিক কবিতার আধুনিক অর্থের নিকটতম অনুবাদ হতে পারে—'বদ্ধ কবিতা'। এই কবিতার মুখ্য উদ্দেশ্য, যে-কোনো পথ চলতি পাঠক যে হুট করে একবার চোখ বুলিয়ে এই কবিতার রস পাবেন, তার উপায় নেই। অরসিকের কাছে এ কবিতার পথ বন্ধ। এর রস আস্বাদ করতে হলে পাঠককে প্রস্তুত হয়ে নিতে হবে, প্রতিটি শব্দ, ধ্বনি, লাইন সাজানো ছোট বড়ো লাইন, লাইনের মাঝখানে ফাঁক—এই সবই অর্থময় হতে পারে। এ ছাড়া উপমার নিরাভরণত্ব। যেমন উদাহরণ দেওয়া হয়েছে, 'আমার হৃদয়ের মতো একটি পাখি'—এই উপমার আরও সরল রূপ, 'হৃদয়-পাখি'—হারমেটিক কবিরা আরও সরল করে বলবেন, শুধু

'প্যাখি'। 'পাখি' মানেই কোনো কবিতায় হৃদয়—সেটা বুঝে নিতে হবে। প্রতীকের সঙ্গে উপমার ঠিক কোথায় তফাত, তা অবশ্য বোঝা যায় না।

শব্দ ব্যবহার সম্পর্কে উনগারেত্তির ভিন্ন মত আছে। তাঁর মতে, শব্দের কোনো আলাদা মেজাজ থাকতে পারে না। কোনো শব্দই ইচ্ছে মতো করুণ বা মধুর বা ক্রুদ্ধ হতে পারে না। সব শব্দই ব্যবহার করতে হবে আদি, ঐতিহাসিক (আমাদের ক্ষেত্রে ধাতুগত) অর্থে। বাংলায় উদাহরণ দেওয়া যায় : 'একটি বিধবা যুবতীর কায়ক্লেশে দিন কাটছে' এই কথার প্রচলিত অর্থ, কষ্টে সৃষ্টে কোনোরকমে দিন কাটছে আর কি। কিন্তু 'কায়ক্লেশে'র আদি অর্থ মেনে বুঝতে হবে, বিধবাটির শারীরিক কষ্টও এখানে উল্লেখিত। কিংবা, প্রতিমা শব্দটির সাধারণ অর্থ খড়-মাটি-রঙের মূর্তি—কিন্তু যদি মনে রাখা যায় প্রতিমা আসলে সাদৃশ্য অর্থে 'প্রতিম' শব্দের স্ত্রীরূপ, তবে 'বৃষ্টির প্রতিমা' বা 'ঝড়ের প্রতিমা'ও বিসদৃশ হয় না।]

রহস্য-বিরক্তি

স্তব্ধতা যখন অভঙ্গ জাগে
সতেজ শরীরের প্রতি আমার যাত্রা
আমার দিকে তার বাড়ানো হাত রক্তাভ
আমার সামান্য অগ্রসরে সেই হাত পিছিয়ে যায়।

সুতরাং এখানে এই ব্যর্থ অনুসন্ধানে আমি পরাভূত।
সকাল যখন তরঙ্গময় সে এগিয়ে আসে
সে হেসে ওঠে, আমার চোখের সামনে অন্তর্হিত হয়ে যায়।

স্বকৃত উন্মত্ততা, বিরক্তি
প্রভূত নও, কখনও প্রভূত মত্ত এবং মিষ্টি নও তুমি

স্মৃতি কেন তোমার সঙ্গে সমান হাঁটে না ?

তোমার দান কি একখণ্ড মেঘ ?
এ শুধু ফিসফিস এই স্মৃতির বসতি
ভরায় বৃক্ষের শাখা দূরান্ত সঙ্গীতে

স্মৃতি সঞ্চরমাণ ছবি,
বিষণ্ণ বিদ্রূপময়
রক্তের আঁধার…

ছায়াচ্ছন্ন লাজুক ঝর্ণার মতো
অলিভ কুঞ্জের প্রাচীন ছায়া
তুমি ফিরে আসো আমায় ঘুমপাড়ানি গান শোনাতে

তবুও গোপনে প্রত্যুষে
গোপনে আমি কি তোমার ওষ্ঠাধর প্রত্যাশা করতে পারি...
আর কোনোদিন আমি জানবো না !

একটি গ্রামের ভগ্নস্তূপ

এই গৃহগুলির
কিছুই অবশিষ্ট থাকে না
শুধু কয়েকটি
দেয়ালের ভগ্নাংশ

কত মানুষ
যারা ছিল আমার আপন
কেউ নেই
এমন কি দেয়ালও না

কিন্তু আমার হৃদয়ে
একটি ক্রুশচিহ্নও হারায়নি

আমার হৃদয়
এক রকম অত্যাচারিত গ্রাম

[হারমেটিক কবিতার যে-আলোচনা উপরে করা হয়েছে, অনুবাদ কবিতায় তা প্রকাশ করা অসম্ভব। আমরা ইতালির ভাষা জানি না, মূলের প্রতিটি শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ খুঁজে পাওয়া দুরূহ, তা ছাড়া সেভাবে অনুবাদ করাও যায় না। তবে, আমি লাইনের গতি ঠিক করেছি, এবং ইচ্ছে করেই কোনো বাংলা ছন্দের পোশাক পরাইনি। ফলে, পড়তে হয়তো কিছুটা কর্কশ লাগবে।

দ্বিতীয় কবিতাটি অস্ট্রিয়ার সীমান্তে সান মারটিনো শহরের ভগ্নস্তূপ দেখে লেখা।]

উজিনো মনতালে

[ইতালির কবিতায় জীবিত প্রধান ত্রয়ীর মধ্যে মনতালে অন্যতম। আগে উনগারেত্তি প্রসঙ্গে আমরা যে হারমেটিক কবিতার উল্লেখ করেছি, মনতালে সেই ধারার অপর স্তম্ভ। উনগারেত্তির সঙ্গে মনতালের মূল প্রভেদ, সমালোচকদের মতে এই যে, উনগারেত্তির কবিতায় দুঃখের সুর

আছে, কিন্তু সেই দুঃখবোধ খ্রীস্টান-সুলভ—অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত উত্তরণ আছে। কিন্তু মনতালে-র দুঃখবোধ আরও বিধুর, কিছুটা তিক্ত, শেষ পর্যন্ত মুক্তিহীন। মনতালে জানেন, মানুষ শেষ পর্যন্ত বড় নির্জন, এই পৃথিবীটা অর্থহীন, গাছপালা প্রভৃতি শেষ পর্যন্ত বস্তুজগৎ ছাড়া আর কিছুই না! (ছেলেবেলায় তিনি প্রকৃতির সামনে বসে দৈববাণীর প্রতীক্ষায় থেকে নিরাশ হয়েছিলেন।) আধুনিক কবির দ্বিধা এবং হতাশার ছাপ তাঁর কবিতায়, পরবর্তীকালে প্রচারিত একজিসটেনসিয়ালিজমের আভাস পাওয়া যায়। যদিও উনগারেত্তি বড় হয়েছিলেন ফরাসী সাহিত্যের আবহাওয়ায়, এবং মনতালে-র শিক্ষা ইংরেজী আধুনিক সাহিত্য থেকে। ইতালিতে তাঁকে টি· এস· এলিয়টের ধারার কবি বলা যায়।

মনতালে-র জন্ম ১৮৯৬-তে, জেনোয়ায়। প্রথম মহাযুদ্ধে গোলান্দাজ হয়ে লড়াই করেছেন। এখন মিলান শহরে একটি দৈনিক পত্রিকার সম্পাদক।]

দুপুর কাটানো

দুপুর কাটানো, ম্লান, মগ্নতা
ঝলসানো, ভাঙা দেয়ালের পাশে বাগানে,
কান পেতে শোনা, ঝোপের কাঁটার ভিতরে
পাখির কিচির, সাপের চলার খসখস।

মাটির ফাটলে অথবা মাধবীলতায়
লাল পিঁপড়ের আনাগোনা চেয়ে দেখা
কখনো ছড়ায়, কখনো বা সারি বাঁধে
ছোট্ট টিবির উপরে ব্যস্ত পিঁপড়ে।

পাতার আড়াল থেকে দূরে চেয়ে দেখা
রেখায় রেখায় সমুদ্র উত্তাল
বাতাসে তখন কর্কশ ভাবে কাঁপে
তৃণহীন টিলা থেকে ঝিঁঝিদের ধ্বনি।

প্রখর রৌদ্রে কিছু দূর হেঁটে যাওয়া
অনুভবে শুধু বিষণ্ণ বিস্ময়
এ জীবন আর জীবনের যত শ্রম
পাশে হেঁটে যাওয়া—এই দেয়ালের মতো
যে-দেয়ালে ভাঙা বোতলের কাচ বসানো।

বান মাছ

বান মাছ, লাস্যময়ী
হিম সমুদ্রের, বালটিক উপসাগর ছেড়ে
এসেছো আমাদের সাগরে,
আমাদের মোহানায়, নদীর ভিতরে
নদীর প্রবাহ থেকে ক্রমশ গভীরে, প্রবল বন্যায়
ভেসে, নদীর প্রতিটি শাখা-উপশাখায়
শিরা-উপশিরায়, সরু হয়ে—
আরও ভিতরে, পাথরের অভ্যন্তরে ঢুকে
কাদার ভিতর থেকে ফুঁড়ে বেরিয়ে—
তারপর একদিন
চেস্টনাট গাছ থেকে আলোর রেখা এসে ঝলসায়
নিবদ্ধ পুকুরে
পাহাড় থেকে নেমে আসা ঝর্ণায়—
বান মাছ, আলো, চাবুক,
মর্ত্যে ভালোবাসার তীর
যাকে শুধু আমাদের নদীর খাত অথবা
পিরেনিস পর্বতের শুকনো ঝর্ণার পথ
ফিরিয়ে দেয় প্রজনন স্বর্গে ;
সবুজ আত্মা আবার জীবন খোঁজে
যেখানে শুধু জ্বলন্ত বৃষ্টিহীনতা আর
নির্জনতার ক্ষয়,
স্ফুলিঙ্গ বলে ওঠে
সেই তো সব আরম্ভ, যেখানে সব
জমে যায় কাঠকয়লায়, নিহিত কাণ্ঠে ;
তোমার চোখের পাতায় সাজানো
সংক্ষিপ্ত রামধনু
তুমি উজ্জ্বল হও, অচঞ্চল থাকো
মানুষের সন্তানদের মধ্যে, যারা
মগ্ন থাকে তোমার জীবনদায়িনী কর্দমে ;
তুমি কি মানো না
সে তোমারই সহোদরা ?

[মনতালে-র প্রথম যৌবন এবং পরিণত জীবনের দুটি কবিতা এখানে উদ্ধৃত হলো। প্রথমটি তাঁর উনিশ বছর বয়সের রচনা। 'বান মাছ' ইতালীয় ভাষার একটি অত্যন্ত বিখ্যাত কবিতা। সামুদ্রিক

বান মাছ হাজার হাজার মাইল পার হয়ে যায়। হয়তো তারা মাটি ফুঁড়েও যেতে পারে— যেমন ভাবে তারা পুকুরে-ডোবায় আসে— এই কল্পনায় মনতালে বলছেন, বিদ্যুৎ তরঙ্গের মতো হাজার বান মাছ বালটিক থেকে আড্রিয়াটিক উপসাগরে চলে যাচ্ছে ইতালির পর্বতমালা পেরিয়ে, শেষ পর্যন্ত অঙ্গারে পরিণত হয়ে মেয়েদের চোখের মণিতে রামধনু হয়ে থাকছে। কবিতাটির শেষ অংশের 'তুমি' অবশ্যই কোনো নারী। দান্তের স্বর্গনিষিক্ত ভালোবাসা মনতালে-র কবিতায় পাতালচারী বান মাছের রূপ নিয়েছে।]

সালভাতোর কোয়াসিমোদো

[বিক্ষুব্ধ কোয়াসিমোদো চেয়েছিলেন মানুষের পুনর্নির্মাণ। মানুষকে বদলে দিতে। সমালোচকরা ঈষৎ বাঁকা সুরে বলেছেন, কোয়াসিমোদো অতখানি বড় কাজের যোগ্য নন।

অর্থাৎ প্রশ্ন ওঠে, কবি কি শুধুই নতুন সৃষ্টি করে যাবেন ? না, এই সৃষ্টি-করা জগৎ ও সমাজ, পরিপার্শ্ব—এর নানান বৈষম্য দূর করার জন্যও ব্যগ্র হবেন, তার মানে, সমসাময়িককালের সঙ্গেও জড়িয়ে পড়বেন ? কোয়াসিমোদো-র জীবনে এই দু'রকম চিন্তাধারার দুটি স্পষ্ট ভাগ দেখা যায়। প্রথম লেখা শুরু করেছিলেন আত্মমগ্ন কবি হিসেবে, হারমেটিক ধারার অন্যতম, যখন ধারণা ছিল কবিতাতেই কবিতার শেষ, সে সময় নিরপেক্ষ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় নাৎসী বাহিনী যখন ইতালির উত্তরাঞ্চল দখল করে নেয়, তখন নিজের গোপন কক্ষ থেকে বেরিয়ে এসে বিরক্ত এবং ক্রুদ্ধ কবি নেমে এলেন অনেকটা জনতার কাছাকাছি, কবিতা লিখে মানুষকে সচেতন করার দায়িত্ব বোধ করেছিলেন। কোয়াসিমোদো-র এই সামান্য রূপান্তরে পুরনো অনুরাগীরা হতাশ হয়, আবার অন্য একদল নতুন কবির জন্ম হলো বলে অভিনন্দন জানায়। ১৯৫৯-র নোবেল প্রাইজ তাঁকে ইতালীর সবচেয়ে বিখ্যাত কবি হিসেবে পরিচয় জানায় পৃথিবীর কাছে।

কোয়াসিমোদো-র জন্ম ১৯০১ সালে, সিসিলি দ্বীপের সিরাকিউসে। শৈশব সুখে কাটেনি, 'মায়ের প্রতি চিঠি'তে তার চিহ্ন আছে। ধারাবাহিকভাবে লেখাপড়ার সুযোগ হয়নি। যৌবনে 'সিভিল এনজিনিয়ার্স বিউরো'র কর্মী হিসেবে সারা ইতালি ঘুরেছেন। এখন মিলান শহরের স্থায়ী নাগরিক। সমসাময়িক অন্যান্য বিখ্যাতদের মতো কোয়াসিমোদো ইংরাজি বা ফরাসী সাহিত্য থেকে প্রেরণা গ্রহণ করেননি। তাঁর যাবতীয় শিক্ষা স্বদেশের ঐতিহ্যে। প্রতিবেশী গ্রীসের কিছু প্রাচীন কবিতারও তিনি অনুবাদ করেছেন।]

প্রায় গান

সূর্যমুখী ঢলে পড়ে পশ্চিমে, দিন
নিজের ভগ্নস্তূপ চোখে অস্ত যায়,
গ্রীষ্মের বাতাস ভারি হয়ে আসে, নুইয়ে দেয়
গাছের পাতা, কারখানার ধোঁয়া ওঠে।
মেঘের শুকনো আনাগোনা, বিদ্যুতের সিরসিরানির সঙ্গে
অন্তরীক্ষের শেষ খেলা দূরে
সরে যায়। আবার বহু বছরের ভালোবাসা—
খালের দু'পাশে ভিড় করা গাছের মধ্যে এসে
আমরা একটু থমকে দাঁড়াই।

তবু আজ আমাদের দিন, তবু সেই
সূর্য তার ছুটি নিয়ে যায়
স্নেহময় রশ্মির গ্রন্থিগুলি গুটিয়ে।
আমার স্মৃতি নেই, আমি আর কিছু মনে করতে চাই না ;
মৃত্যু থেকে জেগে ওঠে স্মৃতি,
যেমন জীবন অন্তহীন। প্রতিটি দিনই
আমাদের। একটি দিন এর মধ্যে থেমে থাকবে চিরকাল।
তখন তুমি আমার পাশে, হয়তো সেদিন বড় দেরি হয়ে যাবে।
এখানে খালের কিনারায় বসে, আমাদের পা
দুলছে শিশুদের মতো খেলাচ্ছলে,
এসো আমরা জল দেখি, গাছের শাখাপ্রশাখায়
সবুজের গাঢ় হয়ে আসা দেখি।
নিঃশব্দে যে-লোকটা পিছন থেকে গুঁড়ি মেরে আসছে
ওর হাতে কোনো ছুরি লুকোনো নেই
ও তো শুধু একটা মাধবীলতা।

মায়ের কাছে চিঠি

আমি উত্তরাঞ্চলে আছি, দুঃখ নেই। নিজের সঙ্গে
শান্তিতে নেই আমি। কিন্তু আমি কারুর কাছে
ক্ষমা প্রত্যাশা করি না, অনেকের কাছেই আমি
চোখের জলে ঋণী, যেমন মানুষের প্রতি মানুষ।
আমি জানি, তুমি ভালো নেই, তুমি বেঁচে আছো
যেমন সব কবিদের মায়েরা থাকে, দরিদ্র,
প্রবাসী ছেলের জন্য খাঁটি ভালোবাসা বুকে নিয়ে। আজ
আমি তোমাকে চিঠি লিখছি। —তুমি বলবে, তবু এতদিনে
ছেলেটা দুটো কথা লিখে জানালো, সেই ছেলেটা যে
একদিন রাত্তিরে পালিয়ে গিয়েছিল একটা ছোট সাইজের কোট পরে,
পকেটে কয়েক লাইন কবিতা। পয়সা ছিল না, এমন চঞ্চল
যে একদিন কেউ হয়তো ওকে মেরেই ফেলবে !
…মা, আমার মনে পড়ে…

[কোয়াসিমোদো-র অপেক্ষাকৃত সুবোধ্য কবিতা এখানে অনূদিত হলো। নোবেল প্রাইজ পাবার পর তাঁর কিছু কবিতা আমাদের দেশে অনুবাদ করা হয়েছে। উল্লেখযোগ্য সুন্দর অনুবাদ করেছেন জগন্নাথ চক্রবর্তী ও সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত।

তাঁর অধিকাংশ কবিতায় 'তুমি' থাকে, সেই 'তুমি'র কোনো নির্দিষ্ট নাম নেই। কোনো নারী বা

পুরুষ বা যুদ্ধে নিহত কোনো আত্মা বা কবিরই অন্য স্বরূপ, কখনো স্পষ্ট বোঝা যায় না। যখন কোনো নারী বলে মনেও হয়, তখনও কোনো নির্দিষ্ট নারী নয়, মনে হয় যেন সমগ্র মহিলা সমাজের প্রতিনিধি যে-কোনো একজন।]

পীয়ের পাওলো পাসোলিনি

[ভিড়ের রেস্তোরাঁর মধ্যে হঠাৎ টেবিলে লাফ দিয়ে উঠে পাসোলিনি চিৎকার করে বললেন, অনর্থক মানুষ, তোমরা অনর্থক সময় নষ্ট করছো। শোনো আমার কবিতা, এই কবিতাই তোমাদের বেঁচে থাকতে শেখাবে!—পাসোলিনি এইরকম স্বভাবের কবি। ইতালির তরুণ কবিদের মধ্যে পাসোলিনি-ই সবচেয়ে প্রবল এবং দুর্দান্ত, এবং সবচেয়ে বিতর্কমূলক। এক দিকে তাঁর প্রবল জনপ্রিয়তা, অপর দিকে একদল তাঁকে কবি বলেই মানতে চান না। কিন্তু এ পর্যন্ত তাঁর ছ'টি কবিতা-সংগ্রহ বেরিয়েছে। এখন অবশ্য আর তিনি বয়সে ঠিক তরুণ নন।

পাসোলিনির জন্ম ১৯২২-এ। কিছুদিন শিক্ষকতা করেছিলেন, পরে বিরক্ত হয়ে ছেড়ে দেন। তাঁর ধারণা, লেখকদের শুধু লেখা ছাড়া অন্য কোনো জীবিকা থাকা সম্ভব নয়। কিন্তু, বলাই বাহুল্য, পৃথিবীর যে-কোনো দেশেই কোনো তরুণ লেখক, বিশেষত কবি, শুধুমাত্র সাহিত্য রচনা করেই গ্রাসাচ্ছাদন সংগ্রহ করতে পারেন না। ফলে পাসোলিনিকে ফিল্মের স্ক্রিপট লিখতে হয়, কখনো কখনো নিজে অভিনয়ও করেছেন। ইদানীং পাসোলিনি চলচ্চিত্র পরিচালনাতেই মুখ্যত আত্মনিয়োগ করেছেন। ইতালির আধুনিক চলচ্চিত্রকারদের মধ্যে তিনি উল্লেখযোগ্য অন্যতম। তাঁর তোলা যীশুর জীবনী একটি বিতর্কমূলক ছায়াছবি। রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকীতে তিনি ভারতবর্ষে এসেছিলেন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর সারা পৃথিবীতে শিল্পে নিওরিয়েলিজম নামে যে ধারা এসেছে, ইতালিতে যা সবচেয়ে প্রবল, কবিতাতেও তার প্রভাব দেখা যায়। পাসোলিনির কবিতার বিষয় ইতালির সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যা। বর্ণনার ভঙ্গি কখনো অতিবাস্তব, অনেক তাঁর কবিতাকে নিওরিয়েলিস্টিক আখ্যা দিয়েছেন।]

আপেন্নিন

ক্যাসিনো থেকে সেই ছেলেটাকে তার বাপ মা
বিক্রি করে দিয়েছে আনিয়েনের গর্জমান সৈকতে এক
খুনীর কাছে, একটি বেশ্যা ওকে মানুষ করে—
ঔপনিবেশিক রাত্রির মধ্যে যখন কিয়ামপিনোর চোখ
ধুয়ে যাওয়া তারায় অন্ধ, বোজানো চোখের পাতার নিচে
উকুনে হাসিতে ছেলেটা গুনগুন করে সম্রাটদের এরোপ্লেনের
শব্দের সঙ্গে গান গায়, আর পথে পথে
কামের প্রহরীদের পদশব্দ,
ময়লা প্রস্রাবখানার আশেপাশে অপেক্ষা করে
সান পাওলো থেকে সান গিয়োভান্নি পর্যন্ত
রোমের চরম উত্তপ্ত পাড়ায়—শুনতে পাওয়া যায়
রাত্রির অবসন্ন প্রহর বেজে উঠছে
উনিশ শো একান্ন-তে গির্জা থেকে গোয়ালঘর
পর্যন্ত নৈঃশব্দ্যেও ফাটল ধরে।

ইলারিয়ার বন্ধ চোখের পাতায় কাঁপে
ইতালির রাত্রির দূষিত আস্তরণ···অল্প
হাওয়ায় নরম, আলোয় শান্ত···
যুবকদের চিৎকার,
তপ্ত, কটু, ভয়ঙ্কর, উষ্ণ কম্বলের
গন্ধ, এখন ভিজে··· দক্ষিণ অঞ্চলের বুড়োদের
কণ্ঠে চালাকি···সমস্বর গান
সপ্তাহান্তের দুটি পুকুরে পুকুরে, গ্রামে।
পাপের প্রদেশ থেকে, শস্তা নোংরা শুঁড়িখানার
সাদা আলোর হৃদয় পর্যন্ত
শহরের উপকণ্ঠে
মাংস এবং দারিদ্র্য শান্ত সহাবস্থান পেয়েছে,

হাওয়ার শব্দ··তারপর। ইলেরিয়ার
ভারী চোখের পাতায় ঘুম ছাড়া
আর কিছুই নেই। এই মেয়েটির মৃত্যুর রূপ
দিয়েছে সকাল, পূর্বকল্পিত, মার্বেল পাথর
হয়ে যাবে। ইতালির আর কিছুই নেই অবশিষ্ট
শুধু তার মার্বেল মৃত্যু ছাড়া, তার ঊষর
বাধাপ্রাপ্ত যৌবন···

তার চোখের পাতার নিচে, ঘুমের মধ্যে
পৃথিবী সশরীরী, চাঁদের আলোর
রূপালি অন্ধকারে একটি কুমারী-রথ
পাথরের ধস হয়ে নামছে আপেন্নিন থেকে
খাড়া পাহাড় বেয়ে সোজা নেমে যাচ্ছে উপকূলের
দিকে—যেখানে টিরোনিয়ান এবং আড্রিয়াটিকের
ফেনা মুক্তাখচিত।

ঝোপঝাড়ের মধ্যে একখণ্ড নগ্ন ঘাস জমিতে
একটি সবুজ বৃত্তে, সোরাক্টের সবুজ উপত্যকার
চামড়া ও ধাতুর গোল আবরণে ঘুমিয়ে আছে
কালচে জ্যাবজেবে একপাল ভেড়া, আর রাখলের
সমস্ত প্রত্যঙ্গ জমাট বেঁধে আছে

চুন পাথরের ওপরে।

['আপেন্নিন' নামের একটি বিশাল কবিতার একটি অংশের মুক্ত অনুবাদ এখানে দেওয়া হল। আপেন্নিন সমগ্র ইতালিব্যাপী দীর্ঘ পর্বতমালার নাম। উত্তর দিকে এই পর্বতমালা আল্পাসের সঙ্গে মিশেছে। আড্রিয়াটিক সমুদ্রের কাছে এর শিখরের উচ্চতা সাড়ে ন' হাজার ফুট, সেইটাই সর্বোচ্চ। ভিসুভিয়াস সমেত আর কয়েকটি আগ্নেয়গিরি আছে এরই মধ্যে। রোম নগরীর চারপাশ ঘিরে আছে আপেন্নিন—এই পার্বত্য অঞ্চলের ছোট ছোট গ্রামের উল্লেখ আছে এই কবিতায়।]

মার্ঘেরিটা গুইদাচ্চি

[মেয়েদের চোখে দেখা এই পৃথিবী হয়তো সত্যিই অন্যরকম। কিন্তু সাহিত্যে মেয়েদের চোখে দেখা পৃথিবীর সে-রকম কোনো উল্লেখযোগ্য ছবি পাওয়া যায়নি। বাংলায় আমরা যাকে বলি 'দৃষ্টিভঙ্গি'—সেই দৃষ্টিভঙ্গিতেও মেয়েদের সঙ্গে পুরুষদের বহু ক্ষেত্রে ঢের তফাত দেখা যায়। কিন্তু পৃথিবীর মহিলা সাহিত্যিকদের মধ্যে তাঁদেরই আমরা খুব উল্লেখযোগ্য বলি, যাঁদের রচনা অতিমাত্রায় পুরুষালি। পরুষদের সমকক্ষ হবার বদলে মেয়েদের আলাদা কোনো সাহিত্যরীতি নেই। মেয়েদের কৈশোর থেকে যৌবনে রূপান্তরের সংকটকাল, সন্তানের প্রতি স্নেহ, স্বামীর জন্য ত্যাগ স্বীকার, মুখবুজে সংসারের সমস্ত যাতনা সহ্য করা ইত্যাদি বিষয়গুলি পুরুষদের রচনাতেই মহৎভাবে ফুটেছে। কে জানে এগুলো সবই অতখানি সত্যি কিনা।

যদিও আমরা চোখেই দেখতে পাচ্ছি। যেমন, সন্তানের প্রতি জননীর স্নেহ, হাত দু'খানাকে ডানার মতো করে ছেলে-মেয়েদের সব বিপদ থেকে মায়ের আগলে রাখার চেষ্টা, পৃথিবীতে প্রতিদিন চোখে দেখা যায়। কিন্তু চোখে দেখার বাইরেও আরও কিছু অন্ধকার পরিসরে যেতে ছাড়ে না সাহিত্য। জননীর কতখানি আত্মত্যাগ, কিছুই কি আত্মবিপর্যয় নেই? সন্তান যেমন নয়নের মণি, তেমনি সন্তানই জনক-জননীকে প্রতিদিন মৃত্যুর কথা স্মরণ করায়। ছেলেমেয়ে বড় হয়ে ওঠা থেকেই বাপ-মা বুঝতে পারেন তাঁরা কতখানি বার্ধক্য ও মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। এ বিষয়ে পুরুষের লেখা কবিতা আছে, কিন্তু পুরুষরা তো স্বার্থপর নামেই বিদিত। মার্ঘেরিটা গুইদাচ্চির এ-কবিতায় একই সঙ্গে সন্তানের প্রতি স্নেহ এবং নিজের স্বার্থপর ভয়ের কথা আছে।

এই কবিতাটি পুরো বুঝতে হলে জানা দরকার শ্রীমতী মার্ঘেরিটা সুগৃহিণী এবং তিনটি সন্তানের জননী। তাঁর তৃতীয় সন্তান, মেয়ের জন্মের পর এ-কবিতা লেখা। তাঁর এখন বয়েস ৪৫, শিক্ষয়িত্রী। জন্ম ফ্লোরেন্সে ১৯২১-এ, ইংরেজী সাহিত্যে বি· এ· পাশ করার পর ঔপন্যাসিক লুসা প্রিমাকে বিয়ে করেছেন। সাম্প্রতিক ইতালির কবিদের মধ্যে তিনি বিশিষ্ট এবং এই হিসেবে তিনি নতুন ধরনের কবি যে তাঁর রচনা স্পষ্ট ও নির্ভীক এবং একটি নারী হিসেবে তাঁর চোখে দেখা জগতই তিনি দেখাবার চেষ্টা করেন।]

অংশ কবিতা

বহুবার নভেম্বর ফিরে ফিরে আসে
আমার জীবনে, আজ যার শুরু হলো
সে নয় জঘন্যতম ; শান্ত একটি দিন
কিছুটা অস্বস্তিময়। আজ আমি ঝুঁকে আছি
একটি দোল্‌নার কাছে, আমার কনিষ্ঠতম
মেয়েটি ঘুমোয়, তার গভীর রহস্যময় ঘুম, যেন আজও
অতিথি এখানে, এই পৃথিবীর নাগরিক নয়, এখনো অচেনা
আমার স্তনের মধ্যে দুধ ভরে ওঠার সুমিষ্ট ঘ্রাণ আমি
টের পাই, কি এক নরম অনুভব
স্নায়ুর প্রতিটি তন্ত্রে, শরীরের সীমানা ছাড়ায়।
আজ এই ক্লান্ত রক্ত গোপন ঝর্ণার দিকে ফিরে
পুনরায় পুণ্য হলো, রক্তের অপাপ রূপান্তর
শিশুর অপাপ ওষ্ঠে তৃষ্ণা হরণের যোগ্য হয়।
আমার শরীর এক অলৌকিক যন্ত্র, এ-ই শুধু
জীবনের জন্ম দিতে পারে। স্তন দুটি
যেন রূপকথার পাহাড়, এই প্রাচুর্যের নদী
বহে যায় স্বর্ণ যুগে, আর এই অবোধ শিশুর
স্মৃতির গভীরতম নদীগর্ভ সৃষ্টি হয়ে যায়, এ স্মৃতির কাছে জানি
সে আবার ফিরে আসবে একদিন স্বপ্নে কিংবা গাঢ় বেদনায়...
ওর জন্য এই ছবি স্পষ্ট, আর আমি,
আমি উপলক্ষ আজ, সময় নিষ্ঠুর ক্রূর হাতে
আমাকে বিবর্ণ করা আরম্ভ করেছে। হয়তো এই
শেষবার, আমি মাতা, এক শিশুর ধরিত্রী, কেননা আমার
দারুণ বৎসরগুলি শুষ্ক করে টেনে নিচ্ছে রস
শরীরের বিশেষ প্রতঙ্গ থেকে। জানি আজও আমি
একটি জীবন্ত বৃক্ষ, হাওয়ায় ঝিলমিল করে পাতা
শরীরে এখনও আছে জন্মবীজ, কিন্তু জানি ঊষর সময়
অদূরে দাঁড়িয়ে আছে, গ্রাস করে নেবেই আমাকে।
কী চমৎকার এই ক্ষণিক বিরতি, আমি আজ
নিজেই নিজের কাছে হেমন্তের দিন ;
সামান্য আশঙ্কা আর ভয় তাকে ঢেকে আছে।
দীর্ঘ রাজপথ হয়ে আমার অতীত
পিছনে বিস্তীর্ণ, শুধু ভবিষ্যৎ চোখ তুলে এইটুকু জানি

আমার অতীত যত দীর্ঘ ছিল, ভবিষ্যৎ তার
কিছু ছোটো হবে।

['সন্তদের দিন' নামের একটি দীর্ঘ কবিতার অংশ এখানে অনূদিত হলো। যৌবন ও বার্ধক্যের মধ্যবর্তী সাময়িক বিরতিকে তিনি 'শরৎকাল' বলেছেন, যেহেতু ওর পরেই শীত। কিন্তু আমি 'অটামের' অনুবাদ হেমন্ত করেছি, এইরকম অর্থে হেমন্তের উল্লেখ জীবনানন্দ দাশের কবিতায় বাংলায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে।]

জার্মান কবিতা : দৃষ্টিবদল

জুরিখে ত্রিস্তান জারা যখন 'ক্যাবারে ভলটেয়ারে' নীবন সাহিত্যের হৈ-হল্লায় ডাডা আন্দোলন শুরু করেছিল, সেই কাছাকাছি সময়েই বার্লিনের নিউয়ের ক্লাবের সভ্যরা 'নিউপ্যাথেটিক ক্যাবারে'-তে চিৎকার করে অন্য ধরনের কবিতা পাঠ করে নতুন এক্সপ্রেসানিস্ট সাহিত্য আন্দোলনের সূত্রপাত করতে চাইছিলেন। এঁদের বিদ্রোহ কৃত্রিম কবিত্ব এবং আদর্শের বাগাড়ম্বরের বিরুদ্ধে। ওদিকে ইতালির কবি মেরিনেত্তি শুরু করেছেন ফিউচারইজম, প্যারিস থেকে বেরিয়েছে তাঁর ঘোষণাপত্র, ফরাসী ও ইংরেজ কবিরা তাতে আকৃষ্ট হচ্ছেন আস্তে আস্তে, সেই ঢেউ জার্মানিতেও এসে পৌঁছুলো। প্রায় কাছাকাছি সময়ে, এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে, কাছাকাছি ধরনের কিন্তু আলাদা নামের সাহিত্যরীতির উদ্ভব হয়। মূলভাবে বলতে গেলে, ফ্রান্সে সুররিয়ালিজম, ইংলন্ডে ইমেজিজম, ইতালিতে ফিউচারিজম ও জার্মানিতে এক্সপ্রেসানিজম।

জার্মানির এক্সপ্রেসানিজম আন্দোলন অবশ্য খুব সংঘবদ্ধভাবে হয়নি, অনেকটা অপর সাহিত্যগুলির নবীন রশ্মির প্রভাবে স্বতোৎসারিত হয়ে ওঠে। এক্সপ্রেসানিজম কথাটার প্রথম ব্যবহার হয় ফ্রান্সে, শিল্পকলার ক্ষেত্রে, বস্তুত ইমপ্রেসানিস্ট শিল্পীদের থেকে আলাদা হবার জন্যই এই নতুন রীতির উদ্ভব। বিমূর্ত শিল্পেরও শুরু এই সময় থেকে। অর্থাৎ যা চোখে দেখা যায় শিল্প-সাহিত্যের তার প্রতিচিত্র বা ছায়া উপস্থিত করার বিরুদ্ধ মনোভাব জেগে ওঠে, চাক্ষুষ অভিজ্ঞতার বদলে আন্তরিক উপলব্ধির সত্য প্রকাশ করতে চাইলেন এক্সপ্রেসানিস্টরা। বেনডেট্টো ক্রোচের নন্দনতত্ত্বে যেমন সৌন্দর্যের রূপের বদলে অনুভূতিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। ১৯১১ থেকে ১৪ সালের মধ্যেই এক্সপ্রেসানিস্টদের প্রাথমিক বিকাশ, দৃষ্টিবদলের সঙ্গে সঙ্গে এঁরা কবিতায় নতুন ভাষা ও রূপ, বিষয়বস্তু নির্বাচনের স্বাধীনতা আনলেন, সবচেয়ে বিশেষত্ব এঁদের মধ্যে অনেকেরই উপমা বা চিত্রকল্প ব্যবহারের আমূল পরিবর্তনে। যেন, মতন ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করে কবিত্বময় ছবির ব্যবহারের এঁরা সমূল উচ্ছেদ করলেন, ভাব ও চিত্র এক সঙ্গে মিলে-মিশে গেল। ব্যাপারটা আরও স্পষ্টভাবে বোঝা যাবে, যদি মনে করা যায় যে ১৯১৪ সালেই ছাপা হয়েছিল, ফ্রানৎস কাফকার মেটামরফসিস নামের গল্পটি, যার নায়ক গ্রিগর সামসা জেগে উঠে দেখলো সে সত্যিই একটা পোকা হয়ে গেছে, তার মনটা পোকার মতন হয়নি বা সে নিজেকে পোকা হিসেবে ভুল ভাবেনি। এখানে বিধেয় ও ভাবনা একরকম হয়ে গেল।

এক্সপ্রেসানিজমের প্রথম পর্ব খুব সংক্ষেপে শেষ হয়ে যায়, কারণ এর প্রধান উদ্যোক্তারা শীঘ্রই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন, এবং প্রায় সকলেরই মৃত্যু হয় অল্প বয়েসে। প্রথম মহাযুদ্ধ যে কত কবিকে খুন করেছে, তার আর ইয়ত্তা নেই। আলফ্রেড লিসটেনস্টাইনের মৃত্যু হয় পঁচিশ বছরে, যুদ্ধ আরম্ভ হবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। গেয়র্গ ট্রাকল ও আর্নস্ট স্টেডলার দুজনেই যুদ্ধক্ষেত্রে মারা

যান— ঐ বছরেই। অগুস্ট স্ট্রাম— যাঁর নতুনত্বের কায়দা ছিল সবচেয়ে চোখ ধাঁধানো— তিনি যুদ্ধে নিহত হন পরের বছর। যুদ্ধ আরম্ভ হবার দু' বছর আগেই, গেয়র্গ হেইম, যাঁকে বলা হতো ধ্বংসের প্রবক্তা, তিনি এক জলে-ডোবা বন্ধুকে বাঁচাতে গিয়ে নিজেও মারা যান। জেবক ফন হোডিস, যাঁর কবিতাকে প্রথম এক্সপ্রেসানিস্ট কবিতা হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল, তিনি ১৯১৪ সালেই পাগল হয়ে যান। এইভাবে এই তরুণ বিদ্রোহীরা হাউয়ের মতন অল্পকাল দপ্ করে জ্বলে উঠে অকস্মাৎ মিলিয়ে গেলেন। এঁদের নিজস্ব কবিতা কালোত্তীর্ণ হবার উপযোগী হতে সময় পেলো না, কিন্তু মাতৃভাষার কবিতায় একটা বাঁক এনে দিয়ে গেল। এঁদের মধ্যে শুধু একজন, গেয়র্গ ট্রাকলকে আমি বেছে নিয়েছি।

এরপর আরম্ভ হয় এক্সপ্রেসানিজমের দ্বিতীয় পর্ব, অন্যান্য কবিদের আলোচনায় প্রাসঙ্গিকভাবে তার উল্লেখ করা হয়েছে।

স্টেফান গেয়র্গ

[হোল্ডারলিনের কবিতা বাংলায় জনপ্রিয় করেছেন বুদ্ধদেব বসু। হাইনে অনুবাদ করতে প্রলুব্ধ হয়েছেন, রবীন্দ্রনাথ থেকে মুজতবা আলী পর্যন্ত। ১৯৫৬ সাল আন্দাজ হঠাৎ কলকাতায় খুব রিলকের কবিতা পড়ার হাওয়া ওঠে। প্রায় এঁদেরই সমান উল্লেখযোগ্য হয়েও স্টেফান গেয়র্গের কবিতা বাংলায় কখনো কি কারণে যেন খুব মনোযোগ পায়নি। পূর্বোল্লিখিত কবিদের মতো অমন বর্ণময় জীবন নয় তাঁর, হোল্ডারলিনের মতো প্রভুপত্নীকে ভালোবেসে বদ্ধোন্মাদ হননি, হাইনের মতো নির্বাসিত জীবনে রহস্যময়ীর সেবা পাননি, রিলকের মতো দুর্গপ্রাকারে বসে দৈববাণীতে কবিতার লাইন পাননি, বরং হিটলারের সঙ্গে কাঁধ ঘেঁষাঘেঁষি করার ঝুঁকি নিয়েছিলেন।

গেয়র্গের জন্ম ১৮৬৮-তে। কোনো সমালোচকের মতে, তিনি নাকি দশ বছর বয়েসের আগেই বুঝতে পেরেছিলেন যে নিজস্ব ভাষা সৃষ্টি করে তিনি আলাদা জগৎ তৈরি করবেন। ধনী পরিবারে জন্ম, শৈশব থেকেই পিতার কাছ থেকে সাহিত্যচর্চায় প্রশ্রয় পেয়েছেন। বহুদিন পর্যন্ত কবিতা লিখেছেন শুধু নিজেরই জন্য, বা ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধবদের কাছেই শোনাতেন, বিংশ শতাব্দীতে প্রবেশ করার পর নিজেকে তিনি একজন মহাপুরুষ হিসেবে ভাবতে আরম্ভ করে জনসাধারণের মধ্যে তাঁর উগ্র মতবাদ প্রচার শুরু করেন। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে অভ্যুদিত নাৎসীবাদ, নীৎসের মতো গেয়র্গের মতামতকেও ঈষৎ বিকৃত করে কাজে লাগাতে দেরি করেননি। প্রথমদিকে গেয়র্গ কিছুটা বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন, কিন্তু এজরা পাউন্ডের মতো চূড়ান্ত পর্যন্ত যেতে হয়নি, হিটলার ক্ষমতায় আসার পর দলের প্রবক্তা এবং সভাকবি করার জন্য গেয়র্গকে আহ্বান করেন, সেই সময়েই তিনি নিঃশব্দে পালিয়ে যান সুইটসারল্যান্ড এবং অচিরেই মৃত্যু, ১৯৩৩-এ।

প্রভূত পাণ্ডিত্য এবং মনীষা সত্ত্বেও গেয়র্গের কবিতা ক্ষুণ্ণ হয়নি। জার্মান সাহিত্যে তাঁর আসন চিরস্থায়ী। ফরাসী সিম্বলিস্টদের কাছে তাঁর শিক্ষা, বোদলেয়ারের সমগ্র লে ফ্লর দু মাল অনুবাদ করেছেন, র‍্যাঁবোকে গুলি করার পর ভের্লেন যখন দু' বছর জেল খেটে বেরিয়ে আসছেন, গেয়র্গ ছিলেন সেখানে। মোট সাতটি ভাষা তিনি অনুবাদ করেছেন।]

তুমি আলোর শিখার মতো পবিত্র ও ঋজু

তুমি আলোর শিখার মতো পবিত্র ও ঋজু
তুমি সকালের মতো এত কোমল উজ্জ্বল
তুমি মহৎ বৃক্ষের থেকে প্রস্ফুটিত শাখা
তুমি পাহাড়ী ঝর্ণার মতো গোপন সরল

রৌদ্রময় মাঠে মাঠে তুমি আছো আমার সন্নিধে
তুমিই আলোর মতো তুমি কুয়াশায়
সায়াহ্নের শীতে তুমি কেঁপে ওঠো আমার শরীরে
তুমি ঠাণ্ডা হাওয়া, তুমি উষ্ণ দীর্ঘশ্বাস।

তুমি আমার বাসনা তুমি আমার ভাবনা
আমি প্রত্যেক নিশ্বাসে করি তোমাকে গ্রহণ
আমি প্রত্যেক চুমুকে করি তোমাকেই পান
আমি প্রত্যেক সুগন্ধে করি তোমার চুম্বন।
তুমি মহৎ বৃক্ষের থেকে প্রস্ফুটিত শাখা
তুমি পাহাড়ী ঝর্ণার মতো গোপন সরল
তুমি আলোর শিখার মতো পবিত্র ও ঋজু
তুমি সকালের মতো এত কোমল উজ্জ্বল।

দ্বীপের প্রভু

মৎস্যজীবীদের গল্পে শোনা যায়, দক্ষিণ প্রদেশে
সুগন্ধ মশলা, তেল ভরা এক দারুচিনি দ্বীপে
যেখানে বালির মধ্যে ঝলসায় বহুমূল্য মণি
সেইখানে আছে এক পাখি, যার ডানা
মাটিতে ছড়ানো থাকে তবু ঠোঁট তুলে
বিশাল গাছের মাথা ছিঁড়ে আনতে পারে।
শামুকের রস মাখা যেন তার পালকের রঙ
যখন সে উড়ে যায় অল্প উঁচু, বিশাল শরীরে
মনে হয় যেন এক খণ্ড কালো মেঘ।
দিবাভাগে সে লুকোয় বনের ভিতরে
সন্ধেবেলা ফিরে আসে সমুদ্রের পাড়ে
ঝাঁঝি ও নুনের ঘ্রাণ ভরা সেই সমুদ্র বাতাসে
তার মিষ্টি শীষ ওঠে, তীব্র হয়ে ভাসে—
শুশুকেরা গান ভালোবেসে আসে সৈকতের পাশে
সমুদ্রে সোনার পাখনা, স্বর্ণ উচ্ছলতা,
সৃষ্টির প্রথম দিন থেকেই সে ছিল এ-রকম
দৈবাৎ জাহাজ-ভাঙা মানুষেরা এক পলক দেখতে পেতো তাকে
প্রথম যেদিন সাদা পাল তুলে মানব সভ্যতা
জাহাজের মুখ ফেরায় সেই দ্বীপে দৈবের নির্দেশে

সেই পাখি উড়ে গিয়ে বসলো এক পাহাড় চূড়ায়
চেয়ে রইলো নির্নিমেষে তার প্রিয় দ্বীপটির দিকে
বিষাদের চাপা স্বর তুলে মরে রইলো সেখানেই।

[প্রথম কবিতাটি একটি প্রেমের কবিতা বলে মনে হতে পারে, কিন্তু এই বিষয়ে লেখা কোনো বাংলা কবিতা এ পর্যন্ত আমাদের চোখে পড়েনি। ভালোবাসা এখানে শারীরিক আস্বাদের স্তরে এসেছে পর্যন্ত, কিন্তু কবিতাটি একটি ছেলেকে উদ্দেশ্য করে লেখা। অর্থাৎ এই ভালোবাসা অনেকটা গ্রীক আদর্শের। ম্যাক্সমিলিয়ান ক্রনবার্গার নামে একটি দেবপ্রতিম কিশোরকে তিনি ম্যাক্সিমিন নামে ডাকতেন এবং তাঁকে মনে করতেন প্রাচীন গ্রীসীয় আদর্শের প্রতিমূর্তি। ছেলেটি অকালে মারা যায়। গেয়র্গ এই কবিতাটি লেখেন, ম্যাক্সিমিন মারা যাবার কুড়ি বছর পরে। দ্বিতীয় কবিতায় শুশুকদের সঙ্গীত প্রীতির প্রসঙ্গেও প্রাচীন গ্রীসের উপকথার উল্লেখ। কবি অরিওনকে জাহাজে দস্যুরা তাঁর সর্বস্ব লুট করে যখন সমুদ্রে ফেলে দিতে যায়, তখন অরিওন শেষবারের মতো একটি গান গাইবার অনুমতি চেয়েছিলেন। তাঁর মধুর গান শুনে হাজার হাজার শুশুক জাহাজের পাশে এসে ভিড় করে এবং অরিওন তখন নিজেই সমুদ্রে লাফিয়ে পড়েন। এবং শুশুকরা তাঁকে কাঁধে করে নির্বিঘ্নে পাড়ে পৌঁছে দেয়। গেয়র্গের অনেক কবিতাই সভ্যতা শুরু হবার আগের জগৎ নিয়ে।]

হুগো ফন হফমান্সথাল

[হফমান্সথালের জন্ম ভিয়েনায়, ১৮৭৪-এ। যদিও ভিক্টর য়ুগো সম্পর্কে গবেষণা করে ডক্টরেট হয়েছিলেন, কিন্তু নিজের সাহিত্য সাধনায় রোমান্টিসিজমকে অস্বীকার করেছেন। 'দু'জন' কবিতাটি যখন লেখেন, তখন তাঁর বয়েস ২৬, এবং জার্মান সাহিত্যে তাঁর আসন তখনই অবিসংবাদীভাবে স্বীকৃত, কিন্তু ক্রমশ তিনি কবিতা থেকে সরে গিয়ে মঞ্চ জগতে আশ্রয় নেন। জার্মান গীতিনাট্যের গৌরবময় ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত হলো তাঁর নাম। সোফোক্লিস, মলিয়েরের ভাষান্তর ছাড়াও তিনি কয়েকটি কালোত্তীর্ণ ট্র্যাজেডি লিখেছেন নিজে— এবং সুরকার হিসেবে পেয়েছিলেন রিচার্ড স্ট্রাউসকে। এখন জার্মান সাহিত্যে তাঁর সুনাম প্রধানত প্রাবন্ধিক ও নাট্যকার হিসেবে। কিন্তু পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের কবিরা হফমান্সথালের কবিতারই বেশি ভক্ত। ওঁর ছেলে হঠাৎ আত্মহত্যা করায়, ভগ্নহৃদয় হফমান্সথালের মৃত্যু ১৯২৯-এ।]

দু'জন

মেয়েটি এক হাতে নিয়েছে পাত্রখানি
মুখ ও চিবুক বাসনের মতো ডৌল
এমন সহজ, নির্ভয় তার লীলায়িত পথ চলা
হাতের পাত্র থেকে এক ফোঁটা উছলে পড়েনি মাটিতে।
এমনই সহজ এবং কঠিন ছিল পুরুষের হাত
তরুণ অশ্বে আরূঢ় ছিলেন তিনি
এবং তখন অনায়াস ভঙ্গিতে
থামালেন সেই বেগচঞ্চল অশ্ব।

যা হোক, যখন মেয়েটির হাত থেকে
পাত্রটি নিতে হাত বাড়ালেন ঝুঁকে
দু'জনেরই কাছে সে কাজ বিষম কঠিন
দু'জনেই খুব কেঁপে উঠেছিল তখন
দু'জনের হাত ছোঁয়নি পরস্পর
গাঢ় লাল মদ গড়িয়ে পড়লো মাটিতে ।

বহির্জীবনের ব্যালাড

গভীর দু' চোখ নিয়ে শিশু বড়ো হয়
কিছুই জানে না তারা, বড়ো হয়, ফের মরে যায় ।
মানুষেরা চলে যায় যে-যার রাস্তায় ।

তেতো ফল একদিন মিষ্টি হয়ে ওঠে
মরা পাখিদের মতো ঝরে যায় রাতে
কয়েকদিন পড়ে থাকে, ফের মরে যায় ।

হাওয়া আছে সব সময়, তবু বার বার
কত কথা শুনি আমরা কত কথা বলি
শরীরের যন্ত্রপাতি সুখ আর দুঃখ ভোগ করে ।
ঘাসের ভিতর দিয়ে রাস্তা হয়, গ্রাম ও শহর
এখানে ওখানে ভরা পুকুর ও গাছপালা, আলো
কিছু আছে বিশ্রী লোক, কিছু আছে মড়ার মতন ।

কেন এরা বেড়ে ওঠে ? কেন পরস্পর
দু'জন সমান হয় না ? কেন এরা এত সংখ্যাহীন ?
কেন একবার হাসি, তার পরই কান্না, শুকনো হাওয়া ?

এই সব ছেলেখেলা— আমাদের কাছে আর কতটুকু দামী
আমরা ক'জন তবু রয়েছি অসাধারণ, অনন্ত একাকী
চিরকাল ভ্রাম্যমাণ, কখনো খুঁজিনি কোনো শেষ ।

এত সব বিচিত্রকে লক্ষ্য করা কেন প্রয়োজন ?
যা হোক, সেই তো সব কিছু বলে, যে বলে 'সায়াহ্ন'
এই এক শব্দ থেকে ভেসে ওঠে গভীর কাতর স্বর, দুঃখ নিরবধি
শূন্য মৌচাক থেকে যে-রকম প্রবাহিত মধু ।

[হফমান্সথালের "দু'জন" কবিতাটি বর্তমান লেখকের খুব প্রিয়, শুদ্ধ কবিতার রূপাঙ্কিত এই রচনা, অথচ বাংলায় এই কবিতাটির যথাযথ অনুবাদ প্রায় অসম্ভব। কারণ, বাংলা সর্বনামে নারী-পুরুষ বোঝা যায় না। সে বা তার ছাড়া কবিতাটিতে অন্য কোনো বর্ণনা নেই, অথচ বাংলায় মেয়েটি বা পুরুষ লিখিতে বাধ্য হলুম। 'মেয়েটি' ইত্যাদি লেখার বিপদ এই যে, এতে বয়েস বোঝা যায়। বালিকা, কিশোরী, যুবতী, রমণী বা নারী— সবই বয়েসবাচক, যেমন ছেলেটা, লোকটা, লোকটি, পুরুষ ইত্যাদি। অথচ 'সে'— বা 'তার'-এর কোন বয়েস নেই। যথাযথ শব্দের অভাবে বাংলা কবিতা এখনও অতিকথন দোষে দুষ্ট। প্রথম লাইনেই 'মেয়েটি' ব্যবহার করতে না হলে, এই অনুবাদের আকার নিশ্চিয়ই বদলে যেতো।

যেমন, দ্বিতীয় লাইনে, মেয়েটি যে সুরার পাত্রটি ধরে আছে, তার হাতলের সঙ্গে মেয়েটির মুখ ও চিবুকের রেখার তুলনা করা হয়েছে। আমি বরং উপমাটি নষ্ট করে দিয়েছি, তবু হাতল ব্যবহার করিনি। একটি মেয়ের (সুন্দরী, বলাইবাহুল্য) মুখের সঙ্গে তুলনা দিতে, এই রকম কবিতায় হাতলের মতো শব্দ ব্যবহার করতে মন চায় না। চেয়ারের হাতল আছে, লরি স্টার্ট দেবার জন্য যে বিকট লোহার ডাণ্ডাটা ঘোরাতে হয়, সেটার নাম হাতল, অফিসে যাবার সময় ট্রাম-বাসের যে দুর্লভ অংশটুকু ধরে ঝুলে থাকা যায়, তার নামও হাতল, আর চায়ের কাপটি পাতলা ঠোঁটের কাছে তুলে আনার জন্য কোনো নবীনা নারী চম্পক অঙ্গুলিতে কাপের যে-অংশটা ধরে থাকে, তার নামও হাতল ? সত্যি, কী গরীব আমরা। কত অল্পে কাজ চালাচ্ছি।

হাত থেকে মদ চলকে পড়ে যাবার মানে হলো, দু'জনের মিল হবে না। হফমান্সথালের কবিতার প্রতিটি শব্দ গুরুত্বপূর্ণ। মেয়েটির চঞ্চলতা, সহজ ভাব ও পুরুষটির দৃঢ় আত্মবিশ্বাস, তবু দু'জনে যখন মিলিত হয়, তখন কেঁপে উঠেছিল। মদ পড়ে যাওয়া রক্তেরও প্রতীক। অর্থাৎ মিলন। এই শতাব্দীর শুরুতেই প্রথম দেখা দিল মিলনের মধ্যে সব সময় কিছুটা উৎকণ্ঠা, কিছুটা দূরত্ব ও অস্বস্তি।

দ্বিতীয় কবিতার শেষ দিকে 'আমরা', এই শতাব্দী-পরিবর্তনের কবিরা। 'সায়াহ্ন' কথাটির অর্থ— না অর্থ নয়, ভাব—কবিতা। 'সায়াহ্নে'র কথা বলা মানে এখানে কবিতা লেখা। জীবনের সব কিছুই অর্থহীন হয়ে যায়, যদি তা কবিতার মধ্য দিয়ে বলা না যায়।]

রাইনের মারিয়া রিল্‌কে

[রিল্‌কের জন্ম চেকোশ্লোভাকিয়ায়, ১৮৭৫ সালে। কৈশোর কেটেছে সামরিক বিদ্যালয়ে। যৌবনে তিনি নিজের কবিতা ছাপিয়ে প্রাহা শহরের পথে পথে বিক্রি করার চেষ্টা করেছিলেন পর্যন্ত। পরে তাঁর জীবন একেবারে বদলে যায়। একাধিক রূপ ও ধনবতী মহিলা তাঁর ভক্ত হয়েছিলেন ও তাঁর জন্য প্রচুর সুযোগের সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন। একবার তাঁর জন্য একটি সম্পূর্ণ দুর্গ-ভবন ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল, কথিত আছে যার চূড়ায় বসে রিলকে দৈবী প্রেরণার প্রতীক্ষা করে ছিলেন। নীৎসের প্রেমিকা ও ফ্রয়েডের বান্ধবী লু আনড্রিয়াস সালোমির সঙ্গে তিনি রাশিয়ায় ভ্রমণ করেন ১৮৯৯ সালে, সেখানে টলস্টয়ের সঙ্গে পরিচয় হয়। পরের বছর ক্লারা ওয়েস্টহফ নাম্নী ভাস্করকে বিয়ে করার পর প্যারিসে কিছুদিন রোদ্যাঁর কাছে ছিলেন। এর পর অনুরাগী-অনুরাগিণীদের আতিথ্যে বহু দেশ ভ্রমণ করেন। যুদ্ধের সময় তাঁকে জোর করে ডাকা হয়েছিল, তাতে তিনি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন। শেষ পর্যন্ত বহু সাহিত্যিকের স্বাক্ষরিত আবেদনের ফলে তিনি মুক্তি পান। ১৯২৬ সালে সুইটসারল্যানডে লিউকোমিয়া রোগে রিল্‌কের মৃত্যু।

এক শতাব্দীর মধ্যে জার্মান ভাষায় সবচেয়ে বড় কবি এবং পৃথিবী ধ্বংস হবার আগের দিন পর্যন্ত বেঁচে থাকবেন রিল্‌কে। বাংলার প্রধান কবিরা রিল্‌কের অনেক কবিতা অনুবাদ করেছেন, বুদ্ধদেব বসু, সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ মিত্র, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

প্রমুখদের অনুবাদ বিশেষ পরিচিত। রিল্‌কের কবিতার ভাষান্তরণ অতীব শক্ত, কোনো কোনো সমালোচক হয়তো রোদ্যাঁর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সংযোগের কথা মনে রেখেই—তাঁকে বলেছেন, 'শব্দ-ভাস্কর'। শুনেছি বহু শিক্ষিত জার্মানের পক্ষেও 'ডুইনো এলেজি'র বহু সাধারণ বাক্যের অসাধারণ প্রয়োগ বুঝতে পারা যথেষ্ট শক্ত। প্রথম জীবনে সরল রচনা দিয়ে শুরু করে ক্রমশ কঠিন দুর্বোধ্য শিখরে আরোহণ করেছেন রিল্‌কে। এখানে রিল্‌কের দুটি অপেক্ষাকৃত সরল কবিতা, যা বাংলায় আগে অনূদিত হয়নি, দেওয়া হলো।

রিল্‌কে মূল ফরাসীতেও অনেক কবিতা লিখেছেন। টি. এস. এলিয়টও তাঁর কাব্য সংগ্রহের শেষ সংস্করণে কয়েকটি নিজস্ব ফরাসী কবিতা অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। মাতৃভাষায় ছাড়া কবিতা লেখা যায় না— এলিয়ট ও রিল্‌কের ফরাসী রচনা এই ধারণার বিরুদ্ধে যায়। কিন্তু এলিয়টের মূল ফরাসী রচনা ফরাসী দেশে বিশেষ গ্রাহ্য হয়নি। আর রিল্‌কের ফরাসী কবিতা সম্পর্কে ফরাসীরা বলেন, তাঁর রচনায় কিছু 'মিষ্টি ভুল' আছে।}

পাথরের সেতু

পাথরের সেতুর উপরে ঐ যে অন্ধ মানুষটি আছে দাঁড়িয়ে
নামহীন বহু পরিধির সীমা-পাথরের মতন ধূসর
হয়তো ও-ই সে উপাদান, সেই অনন্ত কালের একমাত্র
যাকে ঘিরে বহু দূরে অনাদি নক্ষত্র কাল ঘূর্ণ্যমান,
ও সেই ভিখারী, এখনও সপ্তর্ষিদলে কেন্দ্রবিন্দু
ওর চার পাশ থেকে ঝরে পড়া সকল স্রোতের ধারা চরম উজ্জ্বল।

ও-ই সে অনড় ন্যায় দেবপ্রিয় একমাত্র সৃষ্টি
বসে আছে নানান্ জটিল ধাঁধা রাজপথের কেন্দ্রে
এখানেই মৃত্তিকার জগতের ম্লান প্রবেশের দ্বারপথে
কৃত্রিম মনুষ্য ভিড়ে অন্ধ বসে আছে এখানেই।

মৃতদেহ প্রক্ষালন

[একটি ফ্ল্যাট বাড়ির অগোছালো ঘরে একজন মানুষ মরে পড়ে আছে। তার সেখানে কোনো আত্মীয় বন্ধু নেই। দু'জন স্ত্রীলোককে ডাকা হয়েছে তার মৃতদেহ ধুইয়ে মুছিয়ে দিতে।]

তারা লোকটিকে কিছু চিনেছিল, কিন্তু যে-সময়ে
রান্নাঘর থেকে এলো কুপি, জ্বলতে লাগলো থিরথিরিয়ে
অন্ধকার হাওয়া চলাচলে— সেই অজানা মানুষ
হয়ে এলো সম্পূর্ণ অচেনা। তারা তার কণ্ঠনালী ধুয়ে দিল,
এবং যে-হেতু তারা কিছুই জানতো না তার জীবনের গল্প
নিজেরাই বানিয়ে নিল অন্য জীবন
ধোয়া মোছা ঠিক চলেছে, একজন কেশে উঠলো একবার
একজন এক সময় ভারি ভিজে ভিনিগার স্পঞ্জ

রাখলো সেই মুখে। অর্থাৎ সেই সময়ে একটু বিরতি
দ্বিতীয় নারীর জন্য। শক্ত রুক্ষ ব্রাস থেকে জল
ঝরছে টিপটিপ করে ; মৃতের ভয়ংকর হাত
মুচড়ে থেকে যেন সেই মুহূর্তের সমগ্র গৃহকে
জানাতে চেয়েছে, আর তার কোনো তৃষ্ণা নেই !

এবং সে প্রমাণও করেছে। যেন অপ্রস্তুত হয়ে সেই দু'জন নারী
সংক্ষিপ্ত কাশি দিয়ে আরো দ্রুত মোছা শুরু করে,
তারা কাজ করে যায়, দেয়ালের রঙীন কাগজে
দু'জনের বক্র ছায়া কুঁকড়ে ওঠে, কখনো গড়ায়

যেন পাশবদ্ধ, সেই দেওয়ালের চতুর্দিকে নিঃশব্দ নকশায়
যতক্ষণ চলে সেই দু'জনের সব ধোয়া মোছা
পর্দাহীন জানালার কাছে এক থেমে থাকা রাত্রি
অত্যন্ত নির্দয়। সেই নামহীন দেহ
শুয়ে থাকে নগ্ন পরিচ্ছন্ন, নিয়মের সৃষ্টি হয়।

[ঈশ্বর গরীবদের কেন বেশি ভালোবাসেন ? 'ঈশ্বরের গল্পে' রিল্‌কে বলেছিলেন, ঈশ্বর যখন প্রথম মানুষ সৃষ্টি করলেন, তখন সেই প্রথম মানুষ আদম, বেঁচে ওঠার অতি ব্যস্ততায় নিজেই ঈশ্বরের হাত থেকে লাফিয়ে নেমে যায়। ঈশ্বর যখন এক মুহূর্ত পরে তাকে খোঁজার জন্য তাকালেন (ঈশ্বরের এক মুহূর্ত অর্থাৎ এক কল্পান্ত)— দেখলেন সারা পৃথিবী গিস্‌গিস্ করছে মানুষে, কিন্তু সবাই পোশাক-পরিচ্ছদে ঢেকে আছে, সুতরাং তিনি ঠিক কি ভাবে মানুষকে সৃষ্টি করেছিলেন, তা আর দেখতে পেলেন না। সুতরাং তিনি স্থির করলেন, তিনি এমন একটি দরিদ্র মানুষকে সৃষ্টি করবেন, যে কিছুতেই জামা কাপড় পরে নগ্নতা ঢাকতে পারবে না। ঈশ্বর নিজের আসল সৃষ্টিকে স্বচক্ষে দেখতে পাবেন সব সময়।...রিল্‌কের গুরু রোদ্যাঁও বলতেন, নগ্নতাই পৃথিবীর মূল সৌন্দর্য। প্যারিসের পঁ দু ক্যারুজেল নামে পাথরের সেতুর ওপর বসে থাকা অন্ধ ভিখিরিই এ জন্য প্রথম কবিতাটিতে প্রধান পুরুষ।

দ্বিতীয় কবিতায়, মৃতদেহ ধোয়া মোছা যেন রাজসিংহাসনে আরোহণের অনুষ্ঠানের মতোই ঠিক বিপরীত। বহুমূল্য পোশাক ও মুকুট পরানোর বদলে এখানে সব কিছু খুলে ফেলা জীবন ছেড়ে মৃত্যুর সিংহাসনের অধিষ্ঠানের জন্য। মুখের ওপর ভিজে স্পঞ্জ রাখা, ক্রুশবিদ্ধ যীশুর প্রতীক। রিল্‌কের কবিতায় অন্যত্র সেই বর্ণনা আছে। যীশুর মুখের সামনে মদ-ভেজানো স্পঞ্জ তুলে ধরেছিল নিষ্ঠুর রক্ষীরা। এখানে শবদেহ বুঝিয়ে দিচ্ছে, তার আর তৃষ্ণা নেই। কবিতাটি কথ্য গদ্য ভঙ্গিতে লেখা, চাপা ছন্দ আছে, দ্বিধার মুহূর্তে সামান্য বিচ্যুতি।]

রূডলফ্ আলেকসাণ্ডার শ্রয়েডর

[জার্মান সাহিত্যের জন্ম ধর্মগীতি ও সন্তদের জীবন গাথায়। খ্রীস্টধর্ম প্রচার ও প্রতিষ্ঠার পরেই ইওরোপের অধিকাংশ দেশে আধুনিক ভাষাগুলির জন্ম হয়। কয়েকটি দেশের— যে-সব ভাষাকে বলা হয় রোমান্স ল্যাঙ্গয়েজ, অর্থাৎ ফ্রেঞ্চ, স্প্যানীশ, প্রভাঁসাল, ইতালিয়ান, পর্তুগীজ ইত্যাদি, অর্থাৎ যাদের জননী ল্যাটিন, সেসব দেশের ভাষাগুলির জন্ম হতে একটু দেরি হয়েছে। কারণ, উন্নত-ভাষা ল্যাটিন ছিল শিক্ষিত উচ্চ শ্রেণীর ভাষা এবং সেই ভাষাই হয়েছে প্রথম দিকে খ্রীস্টধর্মের বাহন। কিন্তু ল্যাটিন যাদের কাছে সম্পূর্ণ অজানা, তাদের মধ্যে ধর্ম প্রচারের জন্য গীর্জার প্রচারকরা স্থানীয় ভাষার উন্নতি সাধনে ব্রতী হন। বাংলা দেশেও শ্রীরামপুরের পাদরীদের বাংলা গদ্যের চর্চার কারণ যেমন একই।

যে টিউটনিক জাতির বাসভূমি ছিল ষষ্ঠ-সপ্তম শতাব্দীর জার্মানি, তাদের মধ্যে ইংরেজ ও আইরীশ ধর্মপ্রচারকরা এসে প্রচারের সুবিধের জন্য স্থানীয় ভাষাকে সুষম করতে সাহায্য করেন। সেই সমস্ত ধর্মগীতি থেকেই জার্মান সাহিত্য ধীরে ধীরে রূপ নেয়। বাংলা কবিতারও জন্ম বৌদ্ধদের ধর্মপ্রচারের কারণে, কিন্তু নিছক ধর্ম ও দেবদেবীদের প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে রক্ত মাংসের মানুষকে সাহিত্যে উপজীব্য করতে বাঙালি লেখকদের বড় দীর্ঘদিন অপেক্ষা করতে হয়, চৈতন্যদেবের কালও ছাড়িয়ে যায়। কিন্তু কোর্টলি লাভ এবং শিভাল্‌রির অভ্যুত্থান হলে, এবং ততদিনে জেগে-ওঠা ফরাসী সাহিত্যের প্রভাবে, দ্বাদশ শতাব্দীতেই জার্মানিতে বিশুদ্ধ প্রেমগীতি লেখা শুরু হল। ত্রিস্তান এবং সোনালি ইসল্টের অবৈধ মধুর প্রেমের গাথার প্রথম সার্থক রূপ দেখা যায় (যদিও অসমাপ্ত। ত্রয়োদশ শতাব্দীর একেবারে শুরুর জার্মানিতে, গটফ্রিড ফন স্ট্রাসবুর্গের রচনায়।

তবু ধর্মগীতি রচনার স্রোত চিরকাল অক্ষুণ্ণ আছে। শ্রেষ্ঠ জার্মান গীতি-কাব্যের অধিকাংশই ধর্মসঙ্গীত। সেই কারণে আমরা এবার বিংশ শতাব্দীর একজন বিশুদ্ধ ধর্মসঙ্গীতের কবিকে বেছে নিয়েছি। শ্রয়েডের ধর্মে প্রোটেস্টান্ট। কবি হিসেবে তিনি খুব বড় নন্ এবং জার্মান সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁর স্থান হয়তো তেমন উজ্জ্বলভাবে নির্দেশিত হবে না, কিন্তু ধর্মীয় সাহিত্যে তাঁর যুগপৎ বৈদগ্ধ্য ও সরলতা অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য। তাঁর রচনার ধারা খুঁজলে সপ্তদশ শতাব্দীর পল গেরহার্ড কিংবা আরও আগে প্রটেস্টান্ট মতবাদের মূল প্রচারক মার্টিন লুথারের নাম করা যায়। যে সরল এবং প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসী প্রতিবাদ ছিল লুথারের চরিত্র (গীর্জার দরজায় পেরেক ঠুকে নিজের ইস্তাহার লটকে দিয়ে আসা কিংবা মঠ-পরিত্যক্তা নান্‌কে বিয়ে করে গীর্জার অনুশাসন অমান্য করা), পরবর্তী যুগের প্রোটেস্টান্টদের তা চিরকাল প্রেরণা দিয়েছে। লুথার অনূদিত বাইবেল (তাঁর জীবদ্দশাতেই ৩৭৭ সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল) প্রথম দৃঢ় জার্মান গদ্যের নিদর্শন এবং তাঁর রচিত কবিতাবলী ও গান ('ঈশ্বর আমাদের এক দুর্ভেদ্য দুর্গ') পরবর্তী দীর্ঘকাল প্রভাব বিস্তার করেছে এবং শ্রয়েডরের রচনাতেও তার চিহ্ন পাওয়া যায়।

জার্মান সাহিত্যের আর একটি বিশেষত্ব, প্রাচীন গ্রীক সভ্যতার প্রতি আকর্ষণ। খ্রীস্টধর্ম প্রচারের পর ঈশ্বর হয়ে যান এক ও নিরাকার, গ্রীসের হাস্যমুখর-কলহপরায়ণ চমৎকার দেবদেবীরা ধূলিসাৎ হয়ে যান। কিন্তু গেয়র্গের কবিতার আলোচনায় আমরা দেখেছি, গ্রীক দেবদেবীদের সমাজকেই তিনি আদর্শ মানব সমাজ মনে করতেন, হোল্ডারলিনও এরকম বিশ্বাসী এবং আরও অনেকে। শ্রয়েডেরও কিছুটা এই ধারার কবি।

শ্রয়েডের জন্ম ১৮৭৮ সালে। বিদগ্ধ ও সাত্ত্বিক জীবন। বহু ভাষায় পণ্ডিত ; গ্রীক, ফরাসী ও ইংরেজি ক্লাসিকদের অনুবাদক। তাঁর সরল ও মধুর ধর্মগানগুলি রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি' ও 'নৈবেদ্য' পর্যায়ের কবিতাগুলির কথা মনে পড়ায় ; প্রোটেস্টান্টদের বিশ্বাসের সঙ্গে কিছুটা উপনিষদের ধারণারও মিল আছে। শ্রয়েডের কাব্যে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব পড়েছে কিনা বা পড়া সম্ভব ছিল কিনা, আমার জানা নেই।]

দুটি গান

১

আমি তো চাইনি তোমার চোখের বালি
ও চোখের ঐ বিচার সভায় আমি কে ?
সানন্দে আজ ছেড়েছি আমার ঐশ্বর্যের ডালি
যা ছিল তোমার তাই তো দিয়েছি রেখে !
অপর লোকের যত্নে লুকোনো রত্নের সিন্দুকে
আবর্জনার স্তূপ জমে আছে খালি ।

হে পথিক, তুমি থেমো না এখানে একা
এই বীভৎস ছবিতে
এই কুৎসিত ভয়ঙ্করকে দেখা
পারে বুক ভেঙে খান্ খান্ করে দিতে ।
ফেরাও নয়ন, মূর্খের পদচিহ্ন অনুসরণ
তোমার জন্য নয়
ওরা শুধু বলে আবহমানের সৃষ্টির অনুখন
উৎকণ্ঠা ও ভয় ।

তবু হায় আজও নিজেই পারিনে আমি
উৎকণ্ঠায় যা দেখেছি ঐ মুখে
পথিকের মুখে অপমান-লাজ, নিয়েছি নিমেষে চিনে
ঐ অপমান আমারই, লজ্জা রয়েছে আমার বুকে ।

২

যদিও তোমার রয়েছে একটি শরীর
অস্থি মাংসে গড়া
যদিও তোমার পরীক্ষা নয় কঠিন
হৃদয় কঠিন করো !
যে-হৃদয় তুমি পেয়েছো সে যদি কখন
ব্যথা পায়, চায় বাসনায় ঘুরে মরা,
সময়ের দাবি : প্রস্তর হোক মন
প্রস্তরই ভিত, প্রস্তর দৃঢ়তর ।

গটফ্রিড বেন

[কবিতা কি, এর উত্তরে জীবনানন্দ দাশ খুব সংক্ষেপে বলেছিলেন, কবিতা অনেক রকম। এ কথা বলার সময় তাঁর চোখ ছিল সম্ভবত সমগ্র পৃথিবীর কবিতার দিকে, কারণ, বাংলা দেশে এখনও কবিতা অনেক রকম নয়। লিরিকের প্রতিই এখনও বাংলা দেশের ঝোঁক বেশি, একটু সুরেলা, কিছুটা নরম সৌরভময় পাপড়িমেলা না হলে বাংলা কবিতা এখনও যথেষ্ট গ্রাহ্য হয় না।

কবিতা যে অর্থে অনেক রকম, তার মধ্যে কিছু কিছু চাক্ষুষ রূপান্তরও পড়ে। কোনো রকম ছেদচিহ্ন ব্যবহার না করা, কখনও বড়-টাইপ, তারা-ফুটকি এগুলোও বিশেষ উদ্দেশ্যমূলক। কিংবা অ্যাপোলীনেয়ার বা পাউণ্ড যা করেছিলেন, বৃষ্টিধারার মতো বা চ্যাপটা বা সরুভাবে স্তবক সাজানো— কিংবা কামিংস যেমন ছিলেন ক্যাপিটাল লেটারের জাতশত্রু— এগুলিও কবিতারই অঙ্গ। নাটক-সঙ্গীত বা চিত্রকলার অনুগ্রাহকদের বিপরীত, কবিতার পাঠক কখনো চোখের সামনে থাকে না বলেই কবি পরিপূর্ণ আত্মপ্রকাশের জন্য যথেচ্ছ স্বাধীনতা নিতে পারেন। কিন্তু বাংলা দেশে এখনও সামান্য এলোমেলোমিকে পাগলামি বলে গণ্য করা হয়। সেদিক থেকে, গটফ্রিড বেনের কবিতায় ক্রিয়ার অনুপস্থিতি বা বাক্য সাজানোর নিয়ম অগ্রাহ্য করা— খুবই দুর্বোধ্য ঠেকবে। এই সূত্রে গটফ্রিড বেন ছিলেন নিহিলিষ্ট।

বহিরঙ্গ ছাড়াও, অন্যান্য দেশের সাহিত্যের নানা আন্দোলন এই পৃথিবীর দিকে চেয়ে-দেখার ভঙ্গি বার বার বদলে দিয়েছে। এ শতাব্দীর শুরুতে ফরাসী দেশে যখন সুররিয়ালিস্ট আন্দোলন শুরু হয়েছে, জার্মানিতে তখনকার নতুন আন্দোলনের নাম এক্সপ্রেসানিজম। পরবর্তীকালে সুররিয়ালিজম এবং এক্সপ্রেসানিজম দুটোই এসে মিসে যায় বা ধ্বংস হয় একজিসটেনসিয়ালিজমে।

এক্সপ্রেসানিজম সম্পর্কে খুব সংক্ষেপে বলা যায়, এই মতবাদীদের বিশ্বাস ছিল, এই বিশ্বের যে-কোনো বস্তুর আন্তরিক সত্যটুকুই প্রকাশ করা উচিত। তার রূপের বর্ণনা বা শুধু নাম উল্লেখ করা অর্থহীন। এবং এই আন্তরিক সত্যটি প্রত্যেক লেখকের ক্ষেত্রে আলাদাভাবে আসে। এই বিশ্বাসের কেন্দ্র হয় এই সভ্যতা, যা বাইরে থেকে দেখতে চক্‌চকে এবং সহস্র পুষ্পে সজ্জিত মনে হয়, কিন্তু সেটা আসলে ভেতরে পচা। সুতরাং 'সভ্যতা' এই নামটা অর্থহীন। গটফ্রিড বেন বলেছেন, এই বিশৃঙ্খল জগতের কিছুই চিরস্থায়ী নয়, একমাত্র শিল্প ছাড়া।]

নষ্ট অহমিকা
(অংশ)

নষ্ট অহমিকা, স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারে বিপর্যস্ত,
আয়নের শিকার, গামা রশ্মির মেষশিশু
কণিকা ও প্রান্তর, অন্তরের দুঃস্বপ্ন-প্রাণী
তোমার নত্‌রদামের ধূসর পাথরে।
তোমার জন্য দিন কাটে রাত্রিহীন, ভোরহীন
বৎসর তুষারহীন এবং ফল—
ধরে আছে অনন্ত শাসানিময় গোপন
পৃথিবী যেন শূন্য যাত্রা।

কোথায় শেষ তোমার, কোথায় ফেলবে তাঁবু
কোথায় তোমার শূন্য স্তরে প্রসারিত লাভ, ক্ষতি
পশুদের নিয়ে এক খেলা, অনেকগুলি শাশ্বত
তুমি তাদের বাধা পেরিয়ে যাও।
পশুর চাহনি, তারাগুলি ষাঁড়ের অস্ত্র
জঙ্গলের মধ্যে মৃত্যু অস্তিত্ব ও সৃষ্টির কারণ
মানুষ, জাতি সংঘর্ষ, ক্যাটালনিয়ার
প্রান্তর, পশুর গলা দিয়ে নেমে যায়।

পৃথিবী চিন্তায় খণ্ড খণ্ড। স্থান ও কাল
এবং আর যা কিছু এই মানবসমাজকে
বুনেছে ও ওজন করেছে, সবই শাশ্বতের নিত্য ক্রিয়া।
পুরাণকাহিনী মিথ্যুক।
কোথায় যাবে ? কোথা থেকে ? না রাত্রি, না সকাল
না ইভো, না মৃতের জন্য প্রার্থনা
তুমি শুধু চাও একটা ধার-করা স্লোগান,
কিন্তু কার কাছ থেকে ধার-করা ?

আ, যখন তারা সবাই নত হয়ে প্রণাম করেছে এক কেন্দ্রে
যখন চিন্তাশীলরাও শুধু চিন্তা করেছেন ঈশ্বরকে
যখন তারা ছড়িয়ে গেছেন মেষপালক ও মেষের দিকে
প্রত্যেকবার শেষ ভোজনের সুরাপাত্র থেকে রক্ত তাদের শুদ্ধ করেছে।

এবং প্রত্যেকেই এক ক্ষতস্থান থেকে প্রবাহিত
প্রত্যেকেই একটা রুটি ভেঙে টুকরো মুখে দিয়েছে
হে দূরের বাধ্য হিসেবে পরিপূর্ণ সময়
তুমি একবার নষ্ট অহমিকাও গ্রাস করেছিলে।...

[জন্ম ১৮৮৬ সাল। ডাক্তারি পাশ করার পর বেন সৈন্যদলে যোগ দিয়েছিলেন, প্রথম মহাযুদ্ধে ছিলেন সামরিক চিকিৎসক দলে, কিন্তু পরবর্তী কালে ডাক্তারি করার চেয়ে সাহিত্যিকদের দলে আড্ডা মারাই ছিল তাঁর প্রধান কাজ। ১৯১২ সালে প্রকাশিত তাঁর 'লাশকাটা ঘর' নামের প্যামফ্লেট খুব চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে। এই সময়েই তাঁর আত্মজীবনীমূলক কিছু কিছু গদ্য রচনা এক্সপ্রেসানিস্ট সাহিত্যের রূপ স্পষ্ট করে তোলে, এগুলির মধ্যেই তিনি আধুনিক পৃথিবীর বহুখণ্ডিত মানুষকে উপস্থিত করেন।

এক সময় তিনি নাৎসীদের রাজনৈতিক মতবাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন, কিছুটা যুক্তও হয়েছিলেন। কিন্তু পরে সংস্কৃতির জগতে নাৎসীদের উৎপাত তাঁর পছন্দ হয়নি। তিনি নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নেন, নাৎসীরা তাঁর সমস্ত রচনা বাজেয়াপ্ত করে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ও তাঁকে

ডাক্তার হিসেবে যোগ দিতে হয়েছিল। যুদ্ধ থেমে গেলে, মিত্রপক্ষও আবার তাঁর রচনা জার্মানিতে নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করে কিন্তু তরুণ জার্মান লেখকদের মধ্যে তাঁর জনপ্রিয়তা বাড়তে থাকে, ১৯৪৯ সালে সুইটসারল্যাণ্ড থেকে তাঁর রচনা আবার প্রকাশিত হলে তাঁর প্রতি শাসকবর্গের বিরূপ মনোভাব ক্রমশ কমতে থাকে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরই, গটফ্রিড বেনের খ্যাতি জার্মানি ছাড়িয়ে সারা ইওরোপে ছড়ায় এবং ইওরোপের একজন প্রধান লেখক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হন। মৃত্যু ১৯৫৬, পশ্চিম জার্মানিতে।

গেয়র্গ ট্রাক্‌ল

[প্রায় বালক বয়েসে, অথবা সদ্য যৌবনেই মৃত্যু, কিন্তু কবি হিসেবে অমর হয়েছেন, এরকম দু' একজন কবি প্রায় প্রত্যেক ভাষাতেই। কীটসের কথা মনে পড়লেই চোখে ভাসে তাঁর রোগ-শয্যায় শুয়ে থাকা শরীর, মাত্র চব্বিশ বছর বয়েসে তাঁর দুঃখিত মৃত্যু। শেলীরও তো মৃত্যু হয়েছিল মাত্র ৩০ বছর বয়সে। কত মানুষ কত দীর্ঘ দিন ব্যর্থ বেঁচে থেকে পৃথিবীকে শুধু ভারি করে রাখে, আর ঐ দুটি ছোকরা পৃথিবীকে কত ধনী করে দিয়ে গেল। ফরাসী ভাষায় এ রকম উদাহরণ বেশি। র‍্যাঁবো-র কথা উল্লেখ করে লাভ নেই, কারণ র‍্যাবো শুধু ফরাসী ভাষায় নয়, সারা পৃথিবীতেই দেব-দানবের সমাহারে সৃষ্টি এরকম এক বালকের অলৌকিক কীর্তির আর দ্বিতীয় উদাহরণ নেই। কিন্তু এ প্রসঙ্গে লাফর্গের কথা খুব মনে পড়ে। মাত্র সাতাশ বছরের মৃত্যু, কিন্তু লাফর্গের নাম ফরাসী ভাষায় চিরকালীন হয়ে গেছে, এবং নিজের চেয়েও অনেক বেশি প্রতিভাবান কবিদের (পাউণ্ড, এলিয়ট, হার্ট ক্রেন) প্রভাবিত করেছে— ঐ তিক্ত, হতাশ, করুণাপ্রার্থী যুবা। ইতালিতেও আমরা দেখেছি, গুইদো গৎসানো রোগের হাত থেকে বাঁচার জন্য সারা পৃথিবী ঘুরেও বাঁচতে পারেননি, তেত্রিশ বছরে মৃত্যু।

জার্মানিতে এরকম গেয়র্গ ট্রাক্‌ল। ভয় ও বীতস্পৃহার মধ্যে মাত্র সাতাশ বছরে মৃত্যু। প্রথম মহাযুদ্ধে কর্পোরাল হিসেবে লড়াই করেছে একজন অস্ট্রিয়ান, অ্যাডল্‌ফ হিটলার, আর, আরেকজন অস্ট্রিয়ান— গেয়র্গ ট্রাক্‌ল অ্যাম্বুলেন্স বাহিনীতে শুশ্রূষা করেছেন। কিন্তু মানুষকে বাঁচাবার কাজ ট্রাক্‌ল বেশিদিন করতে পারেননি, কারণ তাঁর নিজেরই বাঁচার কোনো ইচ্ছে ছিল না। জন্ম ১৮৮৭, ছেলেবেলা থেকেই নানারকম মাদকদ্রব্য গ্রহণ করে নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। এই পৃথিবীটা ছিল তাঁর কাছে ভয়ের বস্তু সেই ভয় তাঁকে সব সময় তাড়া করে ফিরতো। কবিতা লেখা ছাড়া তাঁর জীবনের আর কোনো অবলম্বন ছিল না। গ্রোডেকের যুদ্ধের পর রক্তাক্ত প্রান্তরে দাঁড়িয়ে সূর্যাস্ত দেখে তাঁর মন স্তম্ভিত হয়ে যায়, তা ছাড়া, ট্রাক্‌ল তখন মেডিকেল কোরের লেফটেনান্ট, তাঁর অধীনে ৯০ জন গুরুতর আহত সৈনিক, তাদের বাঁচাবার কোনো উপায়ই তাঁর হাতে নেই— এই পরিবেশে তাঁর মানসিক ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যায়। তাঁকে মানসিক হাসপাতালে পাঠানো হল তখন, সেখানেই তিনি আত্মহত্যা করলেন, সেদিন ৩রা নভেম্বর, ১৯১৪।

এক্সপ্রেসানিস্ট লেখকদের মধ্যে ট্রাক্‌লের স্থান অত্যন্ত উঁচুতে। জার্মান কবিতার তিনি একদিকে মোড় ঘুরিয়েছেন এবং সাম্প্রতিক লেখকদের ওপর তাঁর প্রভাব প্রবল। জীবনে অত হতাশা ও অসহায়তা থাকলেও ট্রাক্‌লের কবিতাবলী ভারি মধুর, এবং বেঁচে থাকার উপযোগী একটা মিষ্টি আশার ইঙ্গিত আছে।]

একটি শীতের সন্ধ্যা

শার্সির গায় ঝুরুঝুরু ঝরে তুষার
গির্জায় বাজে করুণ দীর্ঘ ধ্বনি
খানার টেবিলের চামচ পিরিচ সাজানো
সজ্জিত গৃহ, মনোরম তাপ, শান্ত।

বহু পথ ঘুরে কারা যেন ফিরে আসে
আঁধার পথের পাশে দরজায় থামে
দরজার পাশে দয়ালু বৃক্ষ, থোকা থোকা সোনাঝুরি
জননী ধরার সুশীতল রস টানে।

দরজা পেরিয়ে মৃদু পায়ে এলো পথিক
গভীর দুঃখে অঙ্গনটুকু নিথর।
টেবিলে সাজানো সতেজ খাদ্য টলটলে লাল মদ
নিখুঁত আভায় উজ্জ্বল হয়ে আছে।

পাশ্চাত্ত্য সঙ্গীত

হে আত্মার নৈশ ডানার আন্দোলন :
রাখাল, আমরা একদা গিয়েছিলাম আঁধার অরণ্যে
লাল হরিণ, সবুজ ফুল এবং ধ্বনিময় বসন্ত আমাদের মান্য করেছিল
হে প্রাচীন ঝিল্লিস্বর
মন্দিরের বেদীতে গড়ানো রক্ত ফুল হয়ে ফুটে আছে
পুকুরের সবুজ নিস্তব্ধতার ওপরে ভাসে একটি পাখির কান্না।
হে ধর্মযুদ্ধ, মাংসময় শরীরের উজ্জ্বল যন্ত্রণা
সন্ধ্যার বাগানে ঝড়ে পড়া রক্তিম ফল
একদিন এখানে ধার্মিক শিষ্যবৃন্দ ভ্রমণ করেছিল
আজ সৈন্যদল এখানে আহত শরীর নিয়ে জেগে উঠে তারার স্বপ্ন দেখে
হে রাত্রির কোমল শস্যস্তবক !

হে তুমি সোনালি শরৎ ও শান্তির কাল
আমরা শান্ত সন্ন্যাসীরা একদিন তোমার মধ্যে বসে
আঙুর পেষণ করেছি
আর আমাদের ঘিরে পাহাড় ও অরণ্য উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল।

হে তোমার শিকারদেশ ও দুর্গ ; সন্ধ্যার নিস্তব্ধতা
নিজের নিরালা ঘরে মানুষ চেয়েছে সুবিচার
নিঃশব্দ প্রার্থনায় দ্বন্দ্ব করেছে ঈশ্বরের জীবিত মাথার জন্য।

হে ধ্বংসের তিক্ত সময়,
এখন আমরা কালো জলের মধ্যে একটি পাথর-কঠিন
মুখের দিকে তাকিয়ে থাকি।
তবু উজ্জ্বল প্রেমিকেরা তুলে ধরে তাদের রূপালি ঢাকনা—
মিলিত এক শরীর।
গোলাপের মতো নরম বালিশ থেকে ভেসে আসে ফুলের সুরভি
আর ঘুম ভাঙার পর মধুর গান।

বের্টল্ট ব্রেহ্‌খ্‌ট
বেচারি বি· বি·

আমি বের্টল্ট ব্রেহ্‌খ্‌ট, এসেছি কালো জঙ্গল-দেশ থেকে
আমার মা আমাকে যখন শহরে আনেন, তখন আমি ছিলুম
তাঁর পেটের মধ্যে। এবং সেই জঙ্গলের সিরসিরানি
আমার শরীরে থাকবে— যতদিন না আমি অদৃশ্য হয়ে যাই।

এই পীচ-বাঁধানো শহরে আমি বেশ মানিয়ে গেছি। প্রথম
থেকেই মুমূর্ষুর প্রতিটি মন্ত্রে আমি সজ্জিত : খবরের
কাগজ, তামাক এবং মদ। সন্দেহপ্রবণ আর অলস
থেকে শেষ পর্যন্ত তৃপ্ত।

আমি মানুষের প্রতি অসাময়িক, ওদের শিষ্টতা অনুযায়ী
আমি মাথায় টুপি পরে থাকি। আমি বলি : এরা সব
অবিকল এক একটি গন্ধ মূষিক ! আবার আমি বলি : তাতে
কিছু যায় আসে না, আমি নিজেও তাই।

কোনো কোনো সকালে আমি আমার খালি দোলনা
চেয়ারে কয়েকটি মেয়েকে এনে বসাই এবং খুশি চোখে তাকিয়ে
থাকি তাদের দিকে। আমি ওদের বলি : আমি হচ্ছি সেই
ধরনের মানুষ, যাদের কক্ষনো বিশ্বাস করা যায় না।

সন্ধের দিকে আমি কিছু লোক জড়ো করি। পরস্পরকে আমরা
ডাকি, 'জেন্টল্‌ম্যান'। ওরা আমার টেবিলের ওপর পা তুলে
দিয়ে বলে, শিগ্‌গিরই আমাদের সুদিন আসছে হে! আমি
আর জিজ্ঞেস করি না : কবে?

শেষ রাত্রের দিকে, ধূসর উষার পাইন গাছরা সময় হিসি করে,
আর গাছের উকুন অর্থাৎ পাখিরা শুরু করে চেঁচামেচি।
সেই সময়টায় শহরে আমি শেষ গ্লাসে চুমুক দিয়ে,
চুরোটের টুকরোটা ছুঁড়ে ফেলে ঘুমোতে যাই, উদ্বিগ্ন।

আমরা অর্বাচীনের দল এমন সব বাড়িতে থাকি, যেগুলো
ধ্বংসের অতীত বলা যায়। (এইভাবেই ম্যানহাটান দ্বীপের
বিশাল কুঠরি বাড়িগুলো তৈরি করেছি আমরা— আটলান্টিকের
মধ্যে দিয়ে কথা বলা তারাগুলোও।)

এইসব শহরগুলোর মধ্যে শেষ পর্যন্ত শুধু তাই টিকে
থাকবে— যা শহরের মধ্যে দিয়ে ঘুরে যায়, হাওয়া! এই বাড়ি
ভোজনবিলাসীদের খুশি করে— খালি হয়ে যায়। আমরা জানি
আমরা শুধু সূচনা, জানি আমাদের পর যারা আসবে—
উল্লেখযোগ্য কিছুই না।

সামনের ভূমিকম্পে আমি আশা করছি, আমার চুরোটটা
নিবে গিয়ে তেতো হতে দেবো না।
আমি, বের্টল্ট ব্রেহ্‌ট, যখন আমি মায়ের পেটে ছিলুম
সেই বহুদিন আগে কালো জঙ্গল-দেশ থেকে এই
পীচ-বাঁধানো শহরে পরিত্যক্ত হয়েছি।

নিমজ্জিতা মেয়েটি

জলে ডুবে গেল, ভেসে গেল খরস্রোতে
পেরিয়ে ঝরনা, ঢেউ উত্তাল নদীতে—
আকাশে সূর্য উজ্জ্বল নীলমণি
যেন তিনি চান ওই মৃতদেহ জুড়োতে।

শরীরে জড়ালো শ্যাওলা, সাগর-পানা
ক্রমশই ভারী হয়ে এলো সেই শরীর

দু পায়ের ফাঁকে ভেসে যায় কত মাছ্
শেষ যাত্রায় প্রাণী ও ঝাঁঝির বাধা বার বার জড়ায়।

সন্ধ্যা আকাশ ধোঁয়ার মতন কালো
রাত্রে তারার আলো হয়ে এলো অনড়
তবুও বিকেলে ছিল স্বচ্ছতা, নীলিমার নীল দিন
আরও কিছু ভোর এবং সন্ধ্যা এখনও রয়েছে সামনে।

যখন পচন শুরু হলো তার ম্লান দেহটিতে জলে
খুব ধীরে ধীরে ঈশ্বর তাকে অনায়াসে ভুলে গেলেন।
প্রথমে মুখটি, তার পর হাত, সব শেষে তার চুল
এখন সে শুধু পচা গলা মাস, নদীতে অন্য পচা মাংসের মতন।

[নাট্যকার ও মঞ্চ প্রযোজক হিসেবে ব্রেহ্‌খটের প্রভূত খ্যাতি তাঁর চমৎকার লিরিকগুলিকে কিছুটা চাপা দিয়ে রেখেছে। কিন্তু তাঁর কবিতার নিপুণ-সারল্য অননুকরণীয়। কখনো কখনো তিনি চীনে কবিতার ভঙ্গি গ্রহণ করেছেন এবং তাঁর মতে তাঁর শব্দ ব্যবহার বাইবেলগন্ধী— যদিও কোনো কোনো সমালোচক তাঁর কাব্য-সংগ্রহকে বলেছেন, 'শয়তানের প্রার্থনা পুস্তক'। এর কারণ, ব্রেহ্‌খট সমাজের নিচু শ্রেণীর নরক-সমান পরিবেশের বঞ্চিত, অপমানিত মানুষের কথা গভীর সহানুভূতির সঙ্গে হাসতে হাসতে বলতে পেরেছেন।

প্রথম কবিতাটিতেই তাঁর জীবনী জানা যায়। এ ছাড়া, উল্লেখযোগ্য তথ্য এই, জন্ম ১৮৯৮, রাজনৈতিক মতবাদের জন্য একাধিকবার নির্বাসন। তিনি সাম্যবাদে বিশ্বাসী এবং জার্মানি বিভাগের পর শেষ পর্যন্ত আশ্রয় গ্রহণ করেন পূর্ব জার্মানিতে। নাট্যকার হিসেবে তাঁর সম্মান পৃথিবীব্যাপী এবং সম্ভবত তিনিই একমাত্র কমুনিস্ট লেখক। যাঁর নাটকের ধারাবাহিক অভিনয় হয় আমেরিকায়। মৃত্যু ১৯৫৬।]

ইনগেবর্গ বাখমান

[এই শতাব্দীর শুরুতেই নিঃসঙ্গতা নামক নির্মম ব্যাধিটি প্রবলভাবে আক্রমণ করে কবি ও শিল্পীদের। অধিকাংশ রচনাতেই ফুটে ওঠে সমাজের প্রতি কবির অনাস্থা, মানুষের সঙ্গে বিচ্ছিন্নতা বোধ। সমস্ত শিল্পই ক্রমশ হয়ে ওঠে অতি ব্যক্তিগত, শিল্পীর একক নিঃসঙ্গতার অভিব্যক্তি। কিন্তু ১৯২০-এর পর জার্মানির একদল লেখক (ব্রেহ্‌খট প্রমুখ) চেয়েছিলেন সমাজের সঙ্গে কবির নতুন করে সম্পর্ক স্থাপন করতে, ঘোষণা করেছিলেন মানুষের সম-ভ্রাতৃত্ব। কিন্তু কয়েক বছর পর হিটলারের উত্থান এই শুভ বিশ্বাসকে তছনছ করে দেয়।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর, জার্মানিতে আবার এক নবীন সাহিত্যিক গোষ্ঠী গড়ে ওঠে, যাদের বলা হয় ৪৭-এর দল। এই দলের লেখকরাও বিদ্রোহী নন, শান্ত, চাপা-আচ্ছন্ন, সঙ্গীতময় রচনা এঁদের বৈশিষ্ট্য। এঁদের মধ্য থেকে আমরা একমাত্র শ্রীমতী ইনগেবর্গ বাখমানকে বেছে নিলাম।

শ্রীমতী বাখমান জাতে অস্ট্রিয়ান, জন্ম ১৯২৬। দর্শন শাস্ত্রে ডক্টরেট। দুটি কবিতার বই এবং একটি ছোট গল্পের বই বেরিয়েছে। এই রূপসী বিদুষী তরুণী, অল্প বয়েসেই যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন

করেছেন, ইংরেজি অনুবাদকরাও বলেছেন, অনুবাদে তাঁর কবিতার রস খুবই নষ্ট হয়।
জার্মান কবিতা সম্পর্কে উৎসাহী পাঠকরা বিশদ পরিচয়ের জন্য পাওলিক-হাকার-মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত জার্মান শ্রেষ্ঠ কবিতা নামের বাংলা অনুবাদের বইটি দেখতে পারেন।]

দুপুর

গ্রীষ্ম ঋতুতে যখন লেবু গাছগুলি
নিঃশব্দে ভরে যায় ফুলে
শহরের বহু দূর থেকে দিনের বেলার চাঁদ
পাঠিয়ে দেয় আলোর ম্লান ছায়া :
দুপুর হয়ে এলো,
এখন ঝর্ণার জলে কাঁপে সূর্যের আলো

এখন প্রাচীন ভগ্নস্তূপের নিচ থেকে বেরিয়ে এসে
ফিনিক্স পাখি মেলে দেয় তার বিক্ষুব্ধ ডানা,
পাথর ছুঁড়ে ছুঁড়ে ক্ষতবিক্ষত হাত
এখন জাগ্রত ফসলে ডুবে যায়।

যেখানে জার্মান আকাশ পৃথিবীকে কালো করে দেয়
সেখানে এক মুণ্ডহীন দেবদূত খুঁজছে একটি কবর
মানুষের ঘৃণার জন্য
আর তোমার জন্য সে রেখে যায় একটি হৃদয়ের চাবি।

একমুঠো দুঃখ মিলিয়ে যায় পাহাড়ের ওপারে।
সাত বছর পর
তোমার পুরোনো চিন্তা তোমার জন্য ওখানে অপেক্ষায় আছে,
সেই দরজার সামনে ঝর্ণায় :
খুব গভীর ভাবে সেদিকে তাকিও না, না, তাকিও না
অশ্রু তোমার চক্ষু ডুবিয়ে দেবে।

সাত বছর পর
যে বাড়িতে মৃতেরা শুয়ে আছে
সেখানে গত কালের হত্যাকারীরা তুলে ধরেছে
তাদের সোনালি পানপাত্র
তুমি চোখ নামিয়ে নাও, চোখ ফেরাও।

এখন পুরো দুপুর।
ছাইয়ের মধ্যে
কুঁকড়ে উঠছে লোহা, কাঁটা ঝোপ ছাড়িয়ে
উড়ছে পাতাকা, আদি কালের স্বপ্নের পাথরগুলি
শিকলে রূপান্তরিত ঈগলকে ধরে আছে।
আলোয় অন্ধ হয়ে যাওয়া আশা শুধু শিউরে ওঠে।

তার শিকল খুলে দাও, শিখর থেকে নামিয়ে
আনো তাকে, তোমার দু হাতে ঢাকো তার চোখ
যেন ছায়া তাকে ঝলসে দেয়।
যেখানে এক জার্মান আকাশ পৃথিবীকে কালো করে
সেখানে মেঘ খোঁজে শব্দ,
বোমার গর্তগুলি ভরিয়ে দেয় স্তব্ধতায়
গ্রীষ্মের আগে সেই শব্দ শুনতে পায় সামান্য বৃষ্টি ধারায়।

সারাদেশ জুড়ে ঘুরে বেড়ায় সেই অব্যক্ত অনুভব
শুধু ফিসফিস করে শোনা যায় :
এখন দুপুর ॥

[ফিনিক্স মিশরের একটি পৌরাণিক পাখি। এই সুন্দর উজ্জ্বল পাখিটি ৫০০ বছর বাঁচার পর নিজেই ইচ্ছে করে আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ে, আবার সেই ছাই থেকে হয় পুনর্জন্ম। ফিনিক্স পাখি অমরত্বের প্রতীক। পাহাড় চূড়ায় যে বন্দী ঈগলের উল্লেখ আছে— সেই ঈগল পাখিও সাধারণভাবে যে-কোনো জাতির প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এখানে পরাভূত জার্মান জাত। কবিতাটি জার্মানির দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পরবর্তী বিষাদ স্পষ্ট। পৃথিবীতে যখন সভ্যতার দ্বিপ্রহর, তখন জার্মানিতে ছায়ার জন্য ভয়।]

আনড্রিয়াস ওকোপেঙ্কো

[বাংলা দেশের কবিতায় দশক ভাগ করার একটি অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর রীতি প্রবর্তিত হয়েছে। তৃতীয় দশক, চতুর্থ দশক, পঞ্চম দশক এই অনুযায়ী কবিদের নিতান্ত জন্মসাল বা কবিতা লেখার কাল দিয়ে শ্রেণী ভাগ করার রীতি আর কোথাও চোখে পড়ে না। কোনো পত্রিকা বা কোনো শক্তিশালী দলকে কেন্দ্র করে কবিতায় স্মৃতির পুনরুদ্ধার বা নতুন ধ্যান ও রীতির উদ্ভব হয়, কবিতার ইতিহাস তৈরি হয় সে-রকমভাবে। বাংলা দেশে কবিদের ইতিহাস লেখা হয়েছে, কবিতার ইতিহাস নিয়ে এখনো আলোচনা শুরুই হয়নি। আমাদের যেমন রবীন্দ্রনাথ, জার্মান কবিতায় এ শতাব্দীতে তেমন বলা যায় রিল্‌কে, কিন্তু আমি অন্তত সাতটি জার্মান কবিতা বিষয়ক গ্রন্থ খুঁজে দেখেছি, কোথাও রিল্‌কে-পূর্ববর্তী কিংবা রিল্‌কে-পরবর্তী কবি— এ ধরনের কোনো আলোচনা চোখে পড়েনি।

এক্সপ্রেসানিজমই এ শতাব্দীতে এ পর্যন্ত জার্মানিতে মুখ্য কাব্যচিন্তা। যদিও আরম্ভের কালে ও পরবর্তী চিন্তায় অনেক পার্থক্য। জার্মান কবিতা পর্যায় শেষ করার আগে আমরা একজন তরুণ

লেখককে বেছে নিয়েছি যাঁর কাব্য এক্সপ্রেসানিস্টদেরই রূপান্তর এবং বলা যায় এক্সপ্রেসানিজমের দ্বিতীয় পর্যায়ের বৈশিষ্ট্যসূচক, তিনি নিজস্ব পদ্ধতিতেও কবিতার শরীর ভাঙাচোরার চেষ্টা করছেন। কবিতার এরকম গঠন বাঙালি পাঠকদের কাছে হয়তো নতুন ও চিত্তাকর্ষক মনে হবে।

আনড্রিয়াস ওকোপেঙ্কো জাতে চেকোস্লোভাক, এখন অস্ট্রিয়ার নাগরিক। পেশায় রাসায়নিক, কিন্তু উগ্রপন্থী আধুনিক কবিদের অন্যতম। তাঁর বয়েস এখন ৩৬, এই কবিতাটি ২৯ বছর বয়েসে লেখা।]

সবুজ সুর

...সবুজ সুর নীল নারী
ছুটির দিন সাদা

আমি সবুজ মাঠের মধ্যে তরুণ গ্রামের
আমার গোলা হলুদ রং নারী সমেত শস্য সমেত
আমার নারী হলুদ রং গোলা সমেত শস্য সমেত
আমি সবুজ শস্য দেশে তরুণ গ্রামের

সূর্য এখন বাজার পথে ঘুরে চলেছেন
আমার নারী বাজার পথে হেঁটে চলেছে
আমার সবুজ শস্য নারী আমার সবুজ মাঠের নারী
আমার সবুজ তরুণী গ্রাম তরুণী এখন বাজার পথে হেঁটে চলেছে

বাজার ঘর ভর্তি এখন চালকুমড়োয়
চালকুমড়োগুলোই এখন বাজার ঘরের সাদা ধুলো
দুপুরবেলার বাজার ঘরের সাদা ধুলো
সাদা ধুলো বাড়ির পথে মেয়ের দিকে বাগান পথে

আমি সবুজ বিকেলবেলা নারীর মধ্যে বাগান এখন
আমি এখন সবুজ হচ্ছি নারীর মধ্যে বাগান এখন
একটি ঘর ঠাণ্ডা একটি নীল রঙের ডোরা কাপড়
দুপুর কলসী নীল গেলাস একটি জল

আমিই সেই ঠাণ্ডা ঘর আমি এখন ঠাণ্ডা ঘরে
আমি এখন যে-খানে শেষে মেয়েটি আমি মেয়ের সঙ্গে
মেয়েটি আর জল ও পাখি পান করেছি কিছুটা জল
কলসী এই ঘর ভিতরে আছি দুজনে

একটা পিঁপড়ে পেরিয়ে গেল ল্যাটিন গ্রামার
জানলা দিয়ে উড়ে এলো গাছের পাতা
এক ফোঁটা জল গড়িয়ে গেল আমার মুখে
একটি ধীর ছোট্ট ঘড়ি সৃষ্টি করে অ্যালুমিনিয়াম বিকেলবেলা

আমি চক্‌চক্‌ রূপে রৌদ্রে অ্যালুমিনিয়াম
ফুলের টবের মাটির নিচে কবর দিলুম আমার ঘড়ি
আমার নারী অরণ্যের ভিতরে ছোটা ঝিঁঝি পোকা না
আমার নারী গ্রীষ্মভূষায় জানলা ঘেঁষে শুয়ে রয়েছে

জানলার ঝিলমিলির ওপর, ছোট চেয়ার হালকা টেবিল তার ওপরে
ছায়ার ওপর রৌদ্র স্মৃতি আজ বিকেলের ওপরে বাগান
আমি এখন বুঝতে পারি ছোট ছেলেটা কেন যে যায় তাশ খেলায়
আমি এখন বুঝতে পারি ছোট মেয়েটা রাখে আকুল সবুজ পাতায়...

আমিই সব ছুটির দিন আমি সবুজ
আমি সবুজ মাঠের ওপর ধানের মধ্যে
আমিই নীল সেই নারীর ঘরের মধ্যে
বিকেলবেলা, আমি নারীর ভিতরে নীল।

[কবিতাটি থেকে তিনটি স্তবক অনুবাদে বাদ দিয়েছি। পুরো কবিতাটির একেবারে শেষ লাইনে মাত্র একটি কমা ও শেষে দাঁড়ি আছে— এ ছাড়া আর কোথাও কোনো ছেদচিহ্ন নেই। সুতরাং কোন বিশেষ্যের সঙ্গে কোন বিশেষণের কী সম্পর্ক— সে দায়িত্ব সম্পূর্ণ পাঠকের। সবুজ রংটিকে কোথাও কোথাও ক্রিয়া হিসেবেও ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন, 'আমি সবুজ বিকেলবেলা'— এখানে অর্থ, বিকেলবেলাটা সবুজ, না আমিই সবুজ, না আমি বিকেলকে সবুজ করছি এর মীমাংসা পাঠক নিজের সঙ্গে তর্কাতর্কি করে ঠিক করে নেবেন। আমার বুঝতে অসুবিধে হয়নি।]

স্প্যানীশ কবিতা : রূপের অনুসন্ধান

আমাদের এই আলোচনা ও অনুবাদের পরিধি বিংশ শতাব্দী। কিন্তু অনেক পাঠক হয়তো আশ্চর্য বোধ করবেন যে, বিংশ শতাব্দীর স্প্যানীশ কবিতার অনুবাদে আমি রুবেন দারিয়ো-কে গ্রহণ করিনি। রুবেন দারিয়ো এ শতাব্দীর শুরুতে অন্তত কুড়ি বছর স্প্যানীশ কবিতায় সম্রাটত্ব করেছেন।

তাঁকে গ্রহণ করিনি, তার কারণ, এই শতাব্দীর শুরুতে প্রায় সব প্রধান ভাষাতেই কতকগুলি আধুনিক, জটিল ও গভীর মনোযোগযোগ্য সাহিত্য আন্দোলনের উদ্ভব হয়েছে এবং বহু নবীন ও বলীয়ান কবির দেখা পাওয়া যায়। কিন্তু স্প্যানীশ ভাষায় সে-রকম কোনো সাহিত্য আন্দোলন দেখা যায়নি। স্পেনের সাহিত্য তখন প্রধানত ফরাসীদের ছত্রছায়ায় মুগ্ধ ছিল। রুবেন দারিয়ো নিজেই একটি আন্দোলনের জন্ম দিয়েছিলেন, যার নাম মডার্নিজম, যা আসলে কিছুই এমন মডার্ন নয়। শুধু আধুনিকতা কথাটার কোনো মানে হয় না, পূর্ববর্তীদের তুলনায় আলাদা কোনো চিন্তা ও রীতির সৃষ্টি না হলে তা নিরর্থক। রুবেন দারিয়ো সে-রকম কিছুই করেননি, পুরোনো সৌন্দর্যতত্ত্ব ও রক্তমাংসের বর্ণনার সঙ্গে তিনি ফরাসী সিম্বলিস্টদের রীতি গ্রহণ করেছিলেন মাত্র। যদিও লেখক হিসেবে তিনি অসীম শক্তিশালী ছিলেন, সন্দেহ নেই। দারিয়োর জন্ম দক্ষিণ আমেরিকার নিকারাগুয়ায়, তরুণ বয়েসে নানা দেশ ঘুরে তিনি চিলিতে এসে কিছু সাহিত্যিকের সংস্পর্শে এসে ফরাসী সিম্বলিস্ট কবিতার সঙ্গে পরিচিত হয়ে মুগ্ধ হয়েছিলেন। সেই প্রভাবে রচিত তাঁর কয়েকটি গ্রন্থ তাঁকে প্রভূত জনপ্রিয়তা এনে দেয় এবং মূল স্প্যানীশ ভূখণ্ডেও তিনি অবিলম্বে প্রধান লেখকের স্বীকৃতি পান। তাঁর একটি ভক্তদল গড়ে ওঠে এবং মডার্নিজম কথাটির সূত্রপাত হয়। আসলে তাঁর বিষয় ছিল বাস্তব থেকে পলায়ন, বিশুদ্ধ রূপের স্তুতি, বিদেশ বা অচেনা দেশের জাঁকজমকপূর্ণ বর্ণনা এবং বোদলেয়ারের কাছ থেকে পাওয়া অবক্ষয় ও পাপের প্রতি কৌতূহল। ১৯১৬-তে রুবেন দারিয়োর মৃত্যুর অল্পদিনের মধ্যেই মডার্নিজমেরও মৃত্যু হয়। দারিয়োর রচনা এখন প্রায় ক্লাসিকাল পর্যায়ে পড়ে।

তবে, জাতিগতভাবেই, স্প্যানীশরা অনেকখানি রূপাভিলাষী। সৌন্দর্যতত্ত্বে ও বিশুদ্ধ রূপের অনুসন্ধান পরবর্তী খাঁটি আধুনিক স্প্যানীশ কবিদের মধ্যেও দেখা যায়। কিন্তু সে সৌন্দর্যজ্ঞান নিছক সময় বহির্ভূত এবং নিছক অভিভূত প্রকাশ নয়। হিমেনেথের অকিঞ্চিৎকর বর্ণনা বর্জনের প্রয়াস এবং লোরকার পল্লীগাথার প্রতি আকর্ষণও এক হিসেবে এই সৌন্দর্য পিপাসার ইঙ্গিতবহ। অন্যান্য দেশের সমসাময়িক কালের মতো নিষ্ঠুরতা, বীভৎস রসের প্রাধান্য, অলৌকিক কিংবা সুপ্ত মনের ভয়াবহতার প্রকাশ স্প্যানীশ কবিতায় বিশেষ দেখা যায় না। আনতোনিও মাচাদো দূরের দ্বীপে বসে তাঁর রচনাগুলিতে রুবেন দারিয়োর বিরুদ্ধে নীরব প্রতিবাদ জানিয়ে গেছেন। দারিয়োর

বাইরের আড়ম্বর ও উচ্ছলতা পরিহার করে তিনি প্রবেশ করেছেন অন্তরে, তাঁর ভাষা প্রায় গদ্যের কাছাকাছি সরল, কিন্তু তিনি নিজের আত্মার দিকে তাকিয়ে তবেই দেখতে চেয়েছেন প্রকৃতির রূপের প্রতিচ্ছবি, আবিষ্কার করতে চেয়েছেন ব্যক্তিগত ঈশ্বরকে। এখান থেকেই শুরু হয়েছে স্প্যানীশ কবিতায় নবীন সার্বজনীনত্ব, আমাদের আলোচনা এখান থেকেই শুরু করেছি। এই শতাব্দীর শুরুতে স্প্যানীশ ভাষায় আলাদাভাবে উচ্চারণ করার মতো প্রচার কোনো সাহিত্য আন্দোলন দেখা দেয়নি, কিন্তু বেশ কয়েকজন অসম্ভব শক্তিমান কবির রচনা উপহার পেয়েছে এ পৃথিবী। ১৯৫৬ সালে হিমেনেথ যখন নোবেল পুরস্কার পান, তখন অনেক সমালোচক বলেছিলেন, এ পুরস্কার শুধু হিমেনেথের নয়, আসলে এ পুরস্কার মিলিতভাবে তিনজনের— হিমেনেথ, মাচাদো এবং লোরকার, কেননা, শেষোক্ত দুজন তখন বেঁচে ছিলেন না, নইলে তাঁদের পুরস্কার না দেওয়া নোবেল পুরস্কারেরই অপবাদ।

মিগুয়েল দে উনামুনো

[এই শতাব্দীর স্প্যানীশ চিন্তা ও সংস্কৃতিতে উনামুনো এক বিশাল স্তম্ভস্বরূপ। সলোমাংকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে বসে তিনি যখন বন্ধু ও শিষ্যদের সঙ্গে গল্পগুজব করতেন তখন তা শোনবার জন্য দেশ-বিদেশ থেকে আসতো লেখক ও দার্শনিকরা। তাঁর কাছে গুণীজন আসতেন তীর্থদর্শনে। স্পেনের প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয় সলোমাংকা, সেখানে উনামুনো ছিলেন গ্রীক ভাষার অধ্যাপক, পরবর্তীকালে ওখানে রেকটর হয়েছিলেন। তাঁর এই প্রকার আলাপচারি সক্রেটিসের কথা মনে পড়ায়, কিন্তু উনামুনোর দুর্ধর্ষ প্রতিভার খ্যাতি ছড়িয়েছিল তরুণ বয়েসেই। জন্ম ১৮৬৪, এবং বিংশ শতাব্দী শুরু হবার মুখেই তিনি তরুণ বুদ্ধিজীবী সমাজের দলপতি।

পরবর্তীকালে দার্শনিক হিসেবে উনামুনো সর্বজনস্বীকৃতি পেলেও, তিনি ধর্মনেতা বা নৈতিক গুরুর ভূমিকা গ্রহণ করেননি। তিনি ছিলেন আজীবন বিপ্লবী, 'উনামুনো' কথাটিরই শব্দার্থ 'বিজয়ী'। গোঁড়া ক্যাথলিকদের দেশেও তিনি একটি ধর্মনিরপেক্ষ সাহিত্য সম্প্রদায় সৃষ্টি করেন। গলায় টাই পরতেন না, শৌখিন শার্ট গায় দিতেন না, কালো গলাবন্ধ কোট পরা তাঁর চেহারা ছিল সাধুর মতো, কিন্তু ধর্মের ক্রীতদাস না হয়ে। যে-সময় রুবেন দারিয়ো স্প্যানীশ কবিতায় আধুনিকতা এনে হই-হই করছেন, বলছেন রক্তমাংসই শ্রেষ্ঠ দেবতা, তখন উনামুনো প্রকাশ করলেন সমস্ত সীমানা ভাঙার নির্দেশ। স্প্যানীশ সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে তিনি ইওরোপীয় তথা সর্ব জাগতিক হতে বললেন। মানুষ সম্পর্কেও তিনি বলেছেন, মানুষ তার জন্মভূমি থেকে লাফিয়ে সারা পৃথিবীর মধ্যে এসে পড়ুক।

উনামুনো কবিতা লিখতে শুরু করেন ৩০ বছর পেরিয়ে যাবার পর। তাঁর কাছে কবিতা ছিল, ব্যক্তিগত জীবনের মুহূর্তকে অনন্ত করা। মুহূর্তকে তিনি আদেশ করেছেন, তুমি দাঁড়াও, আমার ছন্দ তোমাকে আবদ্ধ করেছে! এই কবিতাটি তাঁর একটি অতি বিখ্যাত রচনা। বিষয় ও গভীরতায় কবিতাটি ভালেরির 'সমুদ্রের পাশে কবরের' সঙ্গে তুলনীয়। কবিতাটিতে স্পষ্টত দুটি ভাগ, আমরা শুধু দ্বিতীয় ভাগটিই এখানে অনুবাদ করেছি। এই দ্বিতীয় অংশের যে বক্তব্য, তাঁর অধিকাংশ রচনা ও বহু বিতর্কমূলক বই 'দি ট্রাজিক সেন্স অব লাইফ'-এরও বক্তব্য প্রায় এক। কবিতাটির প্রথম অংশে একটি কবরের বর্ণনা, সেখানে বৃষ্টি পড়ে, রোদ আসে, ভেড়ার পাল চরে বেড়ায়। দ্বিতীয় অংশে, কারখানার ক্রুশচিহ্ন মৃতদেহ পাহারা দেয়, আর জীবিত মানুষের জন্য কোনো ক্রুশ লাগে না—কারণ ঈশ্বর স্বয়ং ব্যগ্র হয়ে মানুষের দিকে তাকিয়ে আছেন। নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্যই ঈশ্বরের মানুষকে দরকার। তুলনীয় রবীন্দ্রনাথের : আমার নইলে ত্রিভুবনেশ্বর তোমার প্রেম হতো যে মিছে।]

ক্যাসটিলিয়ার এক গ্রাম্য কবরে
(অংশ)

তোমার পাশ দিয়ে গিয়েছে পথ, জীবিত মানুষের
তোমার মতো নয়, তোমার মতো নয়, দেয়াল ঘেরা
এ পথ দিয়ে তারা আসে ও যায়
কখনো হাসে আর কাঁদে।
কখনো কান্নার কখনো হাস্যের ধ্বনিতে ভেঙে যায়
তোমার পরিধির অমর স্তব্ধতা!

সূর্য ধীরভাবে মাটিতে নেমে এলে
ঊষর সমতল স্বর্গে উঠে যায়
এখন স্মরণের সময় মনে হয়
বেজেছে বিশ্রাম ও পূজার ঘণ্টা
রুক্ষ পাথরের স্থাপিত ক্রুশখানি
তোমার মাটি ঘেরা প্রাচীরে দাঁড়িয়ে
নিদ্রাহীন অভিভাবক যে-রকম
একলা প্রহরায় গ্রামের গাঢ় ঘুম।

জীবিত সংসারে গীর্জা ক্রুশহীন
এরই তো চার পাশে ঘুমোয় গ্রামখানি
ভক্ত কুকুরের মতন ক্রুশখানি রয়েছে প্রহরায়
স্বর্গে যারা আছে, মৃতের সেই ঘুম।
রাত্রিময় সেই স্বর্গ থেকে যীশু
রাখাল রাজা তিনি
সংখ্যাহীন তাঁর চোখের ঝিকমিকি
ব্যস্ত গণনায় মেঘের ঝাঁকগুলি।

দেয়াল ঘেরা এই কবরে মৃতদল
একই তো মাটি গড়া দেয়াল এখানের
শান্ত নির্জন মাঠের মাঝখানে
একটি ক্রুশ শুধু ভাগ্যে তোমাদের।

আনতোনিও মাচাদো

['আমার হৃদয়ে বাসনার কাঁটা ফুটে ছিল। অনেক চেষ্টায় একদিন আমি সেই কাঁটাটা তুলে ফেললাম। তারপর থেকে আমি আমার হৃদয়ের অস্তিত্বই টের পাই না'—এই রকম সরল ভাবে আনতোনিও মাচাদো কবিতার মূল সত্যগুলি ব্যক্ত.করতে পেরেছেন। পৃথিবী ও মানুষের জীবন ক্রমশ অতি জটিল হয়ে আসছে এই যুক্তিতে আজকের পৃথিবীর কবিতাও যখন জটিল— তখন মাচাদো অতি সহজ ভাষায় আশ্চর্য সৌন্দর্য সাধনা করে গেছেন। কবিতাকে তিনি বলেছেন 'আত্মার হৃৎস্পন্দন', শব্দ নয়, বর্ণ নয়, রেখা নয়, অনুভূতি নয়, কবিতা শুধু 'আত্মার হৃৎস্পন্দন'। এই নিবিড় ধ্যানময়তায় মাচাদো স্প্যানীশ ভাষায় এ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি।

জন্ম ১৮৭৫, দক্ষিণ স্পেনের আন্দালুসিয়ায়, শৈশব কেটেছে ম্যাড্রিদে, যৌবন ক্যাসটিলিয়ায়। ক্যাসটিলিয়ার বোরিয়া শহরে তিনি ছিলেন ফরাসী ভাষার শিক্ষক, এখানকার ভাঙা দুর্গ, দিউরো নদী, অরণ্য, পূর্বপুরুষের গর্ব নিয়ে বেঁচে থাকা বঞ্চিত মানুষ— এই সব নিয়েই তাঁর কবিতা। বিকেলবেলা তিনি একা হাঁটতে হাঁটতে চলে যেতেন বহু দূরে, ফুলের সমারোহ আর ঝরে পড়া পাতার মধ্য দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে তিনি কথা বলতেন নিজের সঙ্গে, প্রকৃতি তাঁকে মুগ্ধ করলেও তিনি প্রকৃতির স্তুতি পাঠক ছিলেন না, প্রকৃতি তাঁকে নিজের সঙ্গে কথা বলতে উদ্বুদ্ধ করতো। এই রকম বেড়াতে বেড়াতেই বনের মধ্যে একদিন লিওনোর নামের একটি মেয়ের সঙ্গে দেখা হয়, সেই অপূর্ব রূপসীকে মনে হয় বনদেবী, জেগে ওঠে ভালোবাসা। পরবর্তী কালে তিনি সেখানেই থেকেছেন, এই অঞ্চলটির কথা তাঁর সব সময় মনে থেকেছে, এখানকার পরিবেশ নিয়েই লিখেছেন। ১৯৩৯-এ ফরাসী দেশে তাঁর মৃত্যু।

মাচাদো ধর্ম বিশ্বাসে ছিলেন অ্যাগনস্টিক বা নির্বিকার। তাঁর অধিকাংশ কবিতারই নাম নেই, কারণ কবিতা যে-হেতু আত্মিক উপলব্ধি—তাই তা রহস্যময় ও আখ্যার অতীত— এই ছিল তাঁর বিশ্বাস। সূর্য, ফুল, স্বপ্ন, আয়না— এই বিষয়গুলি তাঁর কবিতায় বারবার ঘুরে ঘুরে আসে। তাঁর কবিতার একটি প্রবল ক্রটিও আছে, তাঁর কবিতা বড় বেশী অর্থবহ, এত বেশি অর্থ যে অনেক সময় তা রূপকের পর্যায়ে চলে যায়। কবিতার প্রত্যেক লাইনে লাইনে গভীর অর্থ থাকলে— তা কবিতাকে ক্লান্ত করে। যেমন, উপরে উদ্ধৃত প্রথম লাইনে, আমার হৃদয়ে একটা কাঁটা ফুটে ছিল— এইটুকু বলাই যখন যথেষ্ট হতে পারতো সেখানে মাচাদো সেই কাঁটাটাকে থর্ন অফ প্যাসান পর্যন্ত বলে দিতে চান।]

কাল রাতে ঘুমের ভিতরে

কাল রাতে ঘুমের ভিতরে
স্বপ্নে দেখি— দিব্য উদ্ভাসন—
স্বচ্ছ এক ঝর্ণা বহে যায়
ঘুরে ঘুরে আমার হৃদয়ে।

বলো, কোন্ গুপ্ত গলি পথে
জল তুমি এলে মোর কাছে,
নতুন জন্মের ঝর্ণা তুমি
আমি যার পাইনি আস্বাদ ?

কাল রাতে ঘুমের ভিতরে
স্বপ্নে দেখি— দিব্য উদ্ভাসন—
একখানি জীবিত মৌচাক
আমার হৃদয় জুড়ে আছে।

সোনালি রঙের মৌমাছিরা
কাজে ব্যস্ত হৃদয়ে আমার
খুঁড়ে খুঁড়ে পুরোনো ব্যর্থতা
মোম আর মধু তৈরি করে।
কাল রাতে ঘুমের ভিতরে
স্বপ্নে দেখি— দিব্য উদ্ভাসন—
একটি জ্বলন্ত সূর্য উঠে
জেগে আছে বুকের গভীরে।

সে ছিল জ্বলন্ত বিকিরণ
লাল উনুনের মতো তাপ
এবং সে সূর্য, তাই আলো,
সূর্য এসে আমায় কাঁদালো।

কাল রাতে ঘুমের ভিতরে
স্বপ্নে দেখি— দিব্য উদ্ভাসন—
সেই তো ঈশ্বর আমি যাকে
হাতের মুঠোয় ধরে আছি।

একটি বসন্তের ভোর আমায় ডেকে বললো

একটি বসন্তের ভোর আমায় ডেকে বললো
আমি তোমার শান্ত হৃদয়ে ফুল ফুটিয়েছি
বহু বছর আগে, তোমার মনে পড়ে পুরোনো পথিক,
তুমি পথের পাশ থেকে ফুল ছেঁড়োনি।
তোমার অন্ধকার হৃদয়, সে কি দৈবাৎ মনে রেখেছে
আমার সেই পুরোনো দিনের লিলির সুগন্ধ ?
আমার গোলাপেরা কি এখনো ঘ্রাণ মেখে দেয়
তোমার হীরের মতো উজ্জ্বল স্বপ্নের পরীর ভুরুতে ?

আমি বসন্তের ভোরকে উত্তর দিলুম :
আমার স্বপ্নেরা শুধু কাচ
আমি আমার স্বপ্নের পরীকে চিনি না
আমি তো জানিনি, আমার হৃদয় ফুলের মধ্যে আছে !
তুমি যদি সেই পবিত্র ভোরের জন্য অপেক্ষা করো
যে এসে ভেঙে দেবে কাচের পাত্র
তবে হয়তো পরী তোমার গোলাপ ফিরিয়ে দেবে
আমার হৃদয় দেবে তোমায় লিলির গুচ্ছ।

হুয়ান র‍্যামোন হিমেনেথ্

[হিমেনেথের জন্ম ১৮৮১, মৃত্যু ১৯৫৮। জন্ম মৃত্যুর মাঝখানে একমাত্র বড় ঘটনা নোবেল প্রাইজ পাওয়ায় তিনি সমস্ত বিশ্বে, এবং বাংলা দেশেও বহু আলোচিত হয়েছেন। বাহুল্যবোধে হিমেনেথ্ সংক্রান্ত বিবরণ পুণরাচ্চারণ না করে, আমরা হিমেনেথের শুধু দুটি কবিতা এখানে বাংলায় প্রকাশ করলুম। কবিতা দুটি তাঁর জীবনের দুই প্রান্তের, প্রথমটি লিখেছিলেন যখন তিনি সদ্য-যুবা, আর দ্বিতীয়টি লেখেন বার্ধক্যে পৌঁছে, স্বদেশ থেকে দূরে 'সমুদ্রের অন্য পাড়' আমেরিকায় যখন প্রবাসী। প্রথম কবিতাটি সংলাপের ভঙ্গিতে লেখা, এখানে দ্বিতীয় কণ্ঠস্বর কবির। প্রথম স্তবকে জল ও ফুল নামক স্পর্শসহ অস্তিত্বে ব্যক্তিত্ব আরোপ করে, দ্বিতীয় স্তবকে এনেছেন হাওয়া ও মায়া। হিমেনেথের কবিতায়— দণ্ডিত কার্মেলাইট, সেন্ট জন অব দি ক্রশ— ছাব্বিশটি কবিতার জন্য যিনি অমর হয়ে আছেন— তাঁর যথেষ্ট প্রভাব আছে। হিমেনেথের বিখ্যাত কবিতাবলী, প্লাতেরো নামক একটি গাধার সঙ্গে কথাবার্তা, এই বিষয়টিও তিনি পেয়েছেন সেন্ট জন অব দি ক্রশের কাছ থেকে, সেন্ট জন নিজের শরীরটাকেই বলতেন, মাই ব্রাদার অ্যাস। অর্থাৎ, এখানেও, নিজের সঙ্গেই কথাবার্তা।

তাঁর রচনা যতটা গভীর, ততটা অবশ্য গতিশীল নয়। আধুনিক স্প্যানীশ কবিতায় হিমেনেথের অনুকরণ তেমন নেই।]

কেউ না

—ওখানে কেউ না। জল। —কেউ না ?
জল কি কেউ নয় ?—ওখানে
কেউ না। ফুল। —ওখানে কেউ না ?
তবু ফুল কি কেউ না ?

—ওখানে কেউ না। হাওয়া। —কেউ না ?
হাওয়া কি কেউ না ?—কেউ
না। মায়া। — ওখানে কেউ না ? আর
মায়া কি কেউ-না ?

পাখিরা গান গায়

সারা রাত জুড়ে
পাখিরা
আমাকে শোনালে তাদের রঙের গান।
এই রং নয়
সূর্যোদয়ের ঠাণ্ডা হাওয়ায়
তাদের ভোরের ডানার।
এই রং নয়
সূর্যাস্তের অগ্নিবর্ণে
তাদের সান্ধ্যবুকের।
এই রং নয়
রাত্তিরে নিবে যাওয়া
প্রত্যহ চেনা ঠোঁটের
যে রকম নেবে
ফুল ও পাতার
প্রত্যহ চেনা রং
অন্য বর্ণ
আদিম স্বর্গ
এ জীবনে যাকে হারিয়ে ফেলেছে মানুষ।
সেই যে স্বর্গ
ফুল ও পাখিরা
শুধু যাকে চেনে গভীর—
ফুল ও পাখিরা
সুগন্ধে আসে যায়
সৌরজগতে ঘুরে ঘুরে তারা ওড়ে।
অন্য বর্ণ,
অবিনশ্বর স্বর্গ
মানুষ সেখানে স্বপ্নে ভ্রমণ করে।
সারা রাত জুড়ে
পাখিরা
আমাকে শোনালে তাদের রঙের গান।
অন্য বর্ণ
যা শুধু রয়েছে তাদের অন্য জগতে
শুধু রাত্তিরে নিয়ে আসে তারা হাওয়ায়।

কয়েকটি রং
আমি তো দেখেছি অতি জাগ্রত
জানি আমি তারা কোথায়।
জানি আমি ঠিক কখন
পাখিরা আসবে
রাত্রে আমায় শোনাতে তাদের গান।
জানি আমি ঠিক কখন
পেরিয়ে বাতাস পেরিয়ে বন্যা
পাখিরা গাইবে গান।

লেয়ন ফেলিপ

[পৃথিবীর সব দেশেই এই শতাব্দীর কবিতা সম্পর্কে দুর্বোধ্যতার ক্রমাগত অভিযোগ আছে। স্প্যানীশ কবিতা সম্পর্কে সে অভিযোগ খুবই কম খাটে। এখন আমরা এমন একজন কবিকে উপস্থিত করছি, যিনি সরল, স্পষ্ট, কিছুটা গদ্যময় কবিতায় বিশ্বাসী। তাঁর কবিতা বই পড়ার চেয়ে সভা-সমিতিতে আবৃত্তি শুনলে বেশি ভালো লাগে। এইরকম সর্বপ্রকাশ্য কবিতায় লেয়ন ফেলিপ অত্যন্ত জনপ্রিয়।

লেয়ন ফেলিপের পুরো নাম লেয়ন ফেলিপ কামিনো গালিথিয়া। জন্ম স্পেনে, ১৮৮৪। অন্যান্য অনেক স্প্যানীশ কবির মতোই, তিনিও গৃহযুদ্ধের সময় দেশ থেকে পলাতক হন। এখন মেক্সিকোয় স্থায়ী নিবাস।]

আমি নই গভীর সঞ্চারী

—'আমার গভীর সমুদ্র সঞ্চারী বন্ধু পাবলো নেরুদাকে'

আর, কালকেই এসে কেউ বলবে :
এই কবি তো কোনোদিন সমুদ্রের গভীরে আসেনি
এমন কি ছুঁচো বা নেউলের মতো মাটি খুঁড়ে যায়নি ভিতরে
এই কবি কোনোদিন দেখেনি সুড়ঙ্গের প্রদর্শনী
অথবা ভ্রমণ করেনি ঘোর তন্তুর অরণ্যে
সে ঢোকেনি মাংস ভেদ করে, খুঁড়ে দেখেনি হাড়
কখনো পৌঁছাতে পারেনি অস্ত্র, পাকস্থলী পর্যন্ত
শিরায় শিরায় খালে-নদীতে সে অনুপ্রবেশ করতে পারেনি,
রক্তের মধ্যে জীবাণু-বাহী হয়ে পাল তুলে ভ্রমণ করতে করতে
সে পৌঁছোয়নি মানুষের জমাট হৃদয়ে।

কিন্তু সে বৃক্ষ চূড়ায় দেখেছে কীট
গম্বুজের মাথায় দেখেছে পঙ্গপালের ঝড়

হীরকোজ্জ্বল জলকে দেখেছে লালচে আর পঙ্কিল হতে,
দেখেছে হলদে প্রার্থনা
দেখেছে মৃগী রুগী পাদ্রীর পুরু ঠোঁটে সবুজ লালা
গোল ঘরের ছাদে সে দেখেছে চটপট প্রাণী
প্রার্থনার বেদীতে দেখেছে রাত-পোকা
গির্জার দরজায় দেখেছে উইয়ের বাসা
বিশপের শিরস্ত্রাণে দেখেছে ঘুণ...
সে মোহান্ত প্রভুর ধূর্ত পিটপিটে চোখ দেখে বলেছে :
ইঁদারার শুকনো ছায়ায় আলো মরে আসছে ক্রমে
এই আলো আমাদের বাঁচাতেই হবে, কান্নার বন্ধনে ।

ভেলাথকোয়েথ অঙ্কিত 'ভালেকা'র শিশু" চিত্রের পরিচিতি

এখান থেকে কেউ যেতে পারবে না
যতদিন এই ভালেকার শিশুর বিকৃত মাথাটি থাকবে
কেউ চলে যাবে না ।
কেউ না
না সন্ন্যাসী, না আত্মহত্যা ।

প্রথমে চাই তার প্রতি অন্যায়ের প্রতিকার
প্রথমেই চাই তার সমস্যার সমাধান
আমরাই তার সমাধানের জন্য দায়ী
এর সমাধান চাই বিনা কাপুরুষতায়
পোশাকের ডানা মেলে বিনা পলায়নে
অথবা স্টেজের মধ্যে গর্ত খুঁড়ে লুকিয়ে না গিয়ে—
এখান থেকে কেউ চলে যেতে পারবে না
কেউ না
না সন্ন্যাসী, না আত্মহত্যা ।
নিরর্থক
নিরর্থক সব পলায়ন
(ওপরে বা নিচে)
সকলকেই ফিরে আসতে হবে ।
বারবার ।
যতদিন না (এক সুদিনে)
ম্যামব্রিনোর হেলমেট—
এখন আলোর বৃত্ত, হেলমেট বা গামলা নয় ।

সাঞ্চোর মাথায় ঠিক খাপ খেয়ে যায়
এবং আমার ও তোমার মাথায়
ঠিক ঠিক, মাপে মাপে—
সেদিন আমরা সবাই চলে যাবো
ডানা মেলে
তুমি, আমি, সাঞ্চো
এবং সন্ন্যাসী ও আত্মহত্যা।

[ভেলাথকোয়েথ, বাংলায় যাকে আমরা বলি ভেলাস্ কুয়েজ, তাঁর এই বিখ্যাত ছবিটি একটি বাচ্চা বামনকে নিয়ে আঁকা, যার সর্বাঙ্গ বিকৃত, মনও নির্বোধ ও জড়। রাজা চতুর্থ ফিলিপ এই ধরনের বাচ্চা বামনদের রাজসভায় এসে মজা উপভোগ করতেন। কবি এখানে ঐ বামনটিকে সমস্ত মানব সমাজের নির্যাতন, অপমান ও দুঃখভোগের প্রতীক করেছেন।

ডন কুইক্সোট (আসল উচ্চারণ যাই হোক না কেন) এবং তার অনুচর সাঞ্চোকে বাংলাতে আমরা বহুদিন চিনি। ডন কুইক্সোট একদিন একটা নাপিতের পেতলের গামলা কেড়ে নিয়ে মাথায় দিয়ে ভেবেছিলেন, তিনি মহাশক্তিমান দুর্ধর্ষ দৈত্য ম্যামব্রিনোর বিখ্যাত হেলমেটের অধিকারী হয়েছেন। দ্বিতীয় কবিতার শেষ অংশে কবি এর উল্লেখ করে বলছেন, ঐ হেলমেট শক্তি ও সামর্থ্যের প্রতীক, ডন কুইক্সোটের মাথায় সেটা হয়ে ওঠে কবিত্ব ও কল্পনার আলোকমণ্ডল, কিন্তু পৃথিবীর সমস্যা দূর করতে গেলে, সাঞ্চোর মতন তীক্ষ্ণ বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের মাথাতেই তার বেশি দরকার।]

সেজার ভালেখো

[এক বৃহস্পতিবার, প্রবল বর্ষার দিনে প্যারিসে আমার মৃত্যু হবে— এই নিয়ে একটি কবিতা লিখেছিলেন সেজার ভালেখো, তখন তাঁর বয়েস ২৮, এবং আশ্চর্য, এর ১৫ বছর পর কবিতাটিতে বর্ণিত অবস্থায় প্যারিসেই তাঁর মৃত্যু হয়। অনাহারে, প্রবল যন্ত্রণা ও অপমান সহ্য করে, প্যারিসের একটি ঘরে মরে পড়ে ছিলেন তিনি ১৯৩৮ সালে।

তাঁর জন্ম ল্যাটিন আমেরিকার পেরুতে ১৮৯৫ সালে। ১৯১৮ সালে প্রথম কবিতার বই ছাপা হবার পর তাঁকে নির্যাতন, বিচার ও কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়। পরবর্তী জীবনে প্রবল দারিদ্র্য ও উপবাসকে সঙ্গী করে স্পেন ও ফ্রান্সে ভ্রাম্যমান হয়ে কাটিয়েছেন। মৃত্যুর পর তাঁর কবিতা ক্রমশ বিশ্বজনপ্রিয় হয়ে উঠছে।

প্রথম কবিতাটির শিরোনামার অর্থ এই, তাঁর দেশের প্রাচীন রীতি ছিল জীবনের কোনো শুভ ঘটনার স্মৃতিচিহ্ন রাখা হতো সাদা পাথরের ফলক লাগিয়ে, দুঃখের ঘটনায় কালো পাথর।]

একটি সাদা পাথরের ওপর কালো পাথর

প্রবল বর্ষার দিনে প্যারিসে আমার মৃত্যু হবে
সেই দিন,— আমার স্মৃতিতে গাঁথা আছে :
প্যারিসেই মরবো আমি— এ-কথায় ভয় পাইনি কোনো—
শরৎকালের এক বৃহস্পতিবার ঠিক আজকেরই মতো।

বৃহস্পতিবারই ঠিক, কারণ আজকের এই বৃহস্পতিবারে
আমার কবিতা লেখা গদ্যের মতন রুক্ষ হয়ে আসে
দু হাতের হাড়ে খুব ব্যথা করে, যে-রকম ব্যথা আমি কখনো বুঝিনি ;
দীর্ঘ পথ ঘুরে এসে জীবনে কখনো আগে নিজেকে এমন
মনে হয়নি পরিত্যক্ত একা।

সেজার ভালেখো আজ মারা গেছে। সকলেই মেরেছিল তাকে
অথচ কারুর কোনো ক্ষতি সে করেনি।
তারা তাকে ডাণ্ডা দিয়ে মেরেছিল, কঠিন প্রহার
কখনো চাবুকে ; তার সাক্ষী আছে
বৃহস্পতিবারগুলি, দু' হাতের ব্যথাময় হাড়
আর নির্জনতা, বৃষ্টি, দীর্ঘ পথ।

আমিই একমাত্র বিদায় নিয়ে

আমি একমাত্র, পিছনের সবকিছু ফেলে বিদায় নেবো :
আমি এই বেঞ্চি থেকে উঠে দূরে চলে যাচ্ছি
আমি আমার আণ্ডারওয়্যার থেকে দূরে চলে যাচ্ছি
আমার কাজ, এই নির্দিষ্ট জগৎ থেকে আমি চলে যাচ্ছি
আমার ভেঙে ছিটকে পড়া বাড়ির নম্বর থেকে দূরে চলে যাচ্ছি
সব কিছু ফেলে আমিই একমাত্র বিদায় নিয়ে যাচ্ছি।
সাঁজেলিজে থেকে দূরে চলে যাচ্ছি আমি
চাঁদের পিঠে কোনো এক অদ্ভুত গলিপথে একবার বাঁক নিতে।
আমার মৃত্যুও আমার সঙ্গে যাচ্ছে, আমার বিছানা বিদায় নিয়েছে ;
চার পাশে রিক্ত, স্বাধীন মানুষের দল নিয়ে
আমার শারীরিক দ্বিতীয় সত্তা বেড়াতে বেরিয়ে এক এক করে
বিদায় দিচ্ছে তার প্রেতগুলিকে।
আমি সব কিছু থেকে বিদায় নিতে পারি, কারণ
পিছনে সব কিছু পড়ে থাকবে সূত্র হিসেবে।
আমার জুতো, ফিতের গর্ত, কোণায় লেগে থাকা কাদা
পরিষ্কার ধপধপে শার্টের ভাঁজ— এরাও থাকবে।

[দ্বিতীয় কবিতায় উল্লেখিত 'সাঁজেলিজে' হয়তো অনেকেরই পরিচিত, তবু বলি, 'সাঁজেলিজে হচ্ছে প্যারিসের একটি বিখ্যাত, সুরম্য রাজপথ, মূল বানান্ Champs Elysees।]

ফেদেরিকো গারথিয়া লোরকা

[একদিন সকালবেলা, তখনো ভালো করে ঘুম ভাঙেনি, একদল ফ্যাসিস্ট সৈনিক এসে লোরকাকে ডাকলো, এবং বাইরে নিয়ে গিয়ে অল্পক্ষণের মধ্যেই তাঁকে গুলি করে হত্যা করা হলো। তখন লোরকার বয়স মাত্র ৩৭, এবং এইভাবে স্প্যানীশ ভাষায় সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কবি এবং আধুনিক পৃথিবীর একজন বিশিষ্ট কবির মৃত্যু হয়। তখন ১৯৩৬ সাল, স্পেনে গৃহযুদ্ধ ঘনিয়ে এসেছে, বহু কবিই স্পেন থেকে পালিয়ে যান সে সময়, লোরকার মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে এখন অনেকে বলেন যে, ফ্যাসিস্ট বাহিনীর কোনো সৈনিক ব্যক্তিগত শত্রুতা থেকেই লোরকাকে খুন করে।

লোরকার জন্ম ১৮৯৯, ভালো ছাত্র ছিলেন, কবিতা, নাটক এবং ছবি আঁকার প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায় কৈশোরেই। ছাত্রাবস্থার শেষে নাটক লেখা ও পরিচালনা করাই ছিল তাঁর নেশা ও জীবিকা। একসময় সালভাদোর দালি'র সঙ্গে পরিচয়ের সূত্রে সুররিয়ালিজমের প্রভাবে পড়েন কিন্তু গ্রাম্য গাথা, স্পেনের উপকথা ও জিপসীদের জীবন ও চরিত্র নিয়ে লেখাগুলিই তাঁর শ্রেষ্ঠ। বিশেষত জিপসীদের নিয়ে লেখাগুলিই তাঁকে অমর করেছে। অবশ্য, লোরকার এই শেষোক্ত কারণে খ্যাতি খুব পছন্দ ছিল না। একবার এক বন্ধুকে দুঃখ করে ছেলেমানুষের মতো লিখেছিলেন, জিপসী নিয়ে লিখি বলে লোকে ভাবে আমার বুঝি শিক্ষাদীক্ষা কিছুই নেই, আমি যেন একটা গ্রাম্য কবি! আমি মোটেই তা নই।

অনূদিত দ্বিতীয় কবিতাটি জিপসীদের লেখা কবিতাগুলির মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত। সেজন্যও লোরকার দুঃখ ছিল। কারণ, অনেকে এই কবিতাটির আদিম সৌন্দর্য বুঝতে না পেরে শুধু যৌন-সম্ভোগচিত্রই উপভোগ করেছে!]

বিদায়

যদি মরে যাই
জানলা খুলে রেখো

শিশুটির মুখে কমলালেবু
(জানলা থেকে আমি দেখতে পাই)
গম পেষাই করছে এক চাষা
(জানলা থেকে শব্দ শুনতে পাই)

যদি মরে যাই
জানলা খুলে রেখো।

অবিশ্বাসিনী পত্নী

তখন তাকে নিয়ে এলাম নদীর ধারে
ভেবেছিলাম যে সে তখনো কুমারী মেয়ে
কিন্তু তার স্বামী ছিল।

সে রাত ছিল সন্ত জেমস উৎসবের
কিছুটা যেন বাধ্য হয়েই ঠিক তখন
পথের আলো ক্রমশঃ নিবে আঁধার হলো
আলোর মতো জ্বলে উঠলো ঝিঁঝি পোকার সমস্বর

শহর ছেড়ে নির্জনতায় এসে
ছুঁয়ে দিলাম তার ঘুমন্ত স্তন দুটি
তখুনি তারা আমার জন্য পাপড়ি মেলে ফুটে উঠলো
কচুরিপানার মঞ্জরীর মতন।

তার বুকের ব্রেসিয়ারের শক্ত মাড়
খসখসিয়ে উঠলো আমার কানের কাছে
যেন রেশমী এক টুকরো মসৃণতা
দশ ছুরিতে ছিন্নভিন্ন করলো কেউ

পাতার ফাঁকে নেই রূপোলি আলোর রেখা
বৃক্ষগুলি দীর্ঘ হয় ক্রমশ
এক দিগন্ত ভরা অসংখ্য কুকুর পাল
ডেকে উঠলো বহু দূরের নদীর প্রান্তে।

পেরিয়ে কালো জামের বন
রাঙচিতে আর কাঁটাগাছের ঝোপ ছাড়িয়ে
তার চুলের আড়ালে বসে বেলাভূমিতে
নরম কাদায় আমি একটা গর্ত খুঁড়ি।

আমার গলার টাই খুলেছি একটানে
সে খুলেছে তার ঘাগড়া, কাঁচুলি
রিভলবার সুদ্ধ আমার কোমরবন্ধ খুলে রেখেছি
সে খুলেছে চার রকমের অন্তর্বাস।

মাধবীলতা, সাগর ঝিনুক পায়নি এত রূপ
এত মসৃণ, সুন্দর তার ত্বকের রং
স্ফটিক-রঙা দীঘিতে চাঁদের আলোও নয়
তার শরীরে এমন উজ্জ্বলতা।

দুখানি উরু পিছলে যায় উরুর নিচে
হঠাৎ ধরা মাছের মতন যেন অবাক
খানিকটা তার উষ্ণতা আর কিছুটা হিম
জঙ্ঘা ভরা শীত গ্রীষ্ম দুই ঋতু

সেই রাত্রে আমার অশ্ব-ভ্রমণ হলো
জগতের সব পথের মধ্যে সেরা পথে
হীরে-পান্না দিয়ে সাজানো তরুণী ঘোড়া
বল্গা নেই, রেকাব নেই, তবুও বাঁধা।

পুরুষ আমি, তাই কখনো বলতে চাই না
ফিসফিসিয়ে আমায় সে যা শুনিয়েছিল
জিপসীদের ছেলে আমি, এটুকু জানি
গোপন কথা গোপন রাখাই খাঁটি নিয়ম।

চুমোর আঠা, বালির মধ্যে মাখামাখি
নদীর তীর থেকে উঠিয়ে নিলাম তাকে,
অন্ধকারে বনতুলসীর ধারালো পাতা
হাওয়ার সঙ্গে যুদ্ধে মেতে ব্যস্ত তখন।

পুরুষ আমি, জানি পুরুষ-যোগ্য ব্যবহার
খাঁটি জিপসী সন্তানের মতন
এক বাক্স রঙিন সুতো কিনে দিয়েছি তাকে
আড়াই গজ হলুদ-রঙা সাটিনও উপহার।

কিন্তু আমি প্রেমে পড়িনি সেই নারীর
আমি তো ঠিকই বুঝেছিলাম সে বিবাহিতা
তবুও কেন মিথ্যেমিথ্যি বললো আমায় কুমারী সে
যখন তাকে নিয়ে গেলাম নদীর ধারে ?

[জিপসী ও অবিশ্বাসিনী নারী একসঙ্গে শুয়ে ভ্রমণ শুরু করলো। বল্গাহীন অশ্বপৃষ্ঠে ভ্রমণ। লোরকার এই বিখ্যাত কবিতাটি নিয়ে এক সময় বিতর্কের ঝড় ওঠে। লোরকা এখানে একটি নৈতিক সিদ্ধান্তও করেছেন যে, সঙ্গমের পর মেয়েটিকে পরিত্যাগ করার সময় পুরুষটির কোনো গ্লানি নেই— কারণ শুধু এই যে, সে জেনেছে মেয়েটি কুমারী নয়। পুরুষটিকে নির্দোষ দেখাবার জন্য লোরকা এমন একটি কায়দা প্রয়োগ করেছেন, যা অনেক পাঠকের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়। কবিতার সব স্তবকগুলো চার লাইনের হলেও প্রথম স্তবকটি তিন লাইনের। অর্থাৎ একটি লাইন উহ্য আছে, সেখানে আন্দাজ করা যায়, মেয়েটিই প্রথম মিথ্যে কথা বলে পুরুষটিকে প্রলুব্ধ করেছিল।]

রাফায়েল আলবের্তি

[দেবদূত বিষয়ক কবিতাবলীই রাফায়েল আলবের্তির শ্রেষ্ঠ রচনা। যদিও সমুদ্র ও আন্দালুসিয়ার প্রকৃতি বিষয়ক কবিতার জন্য মাত্র ২৩ বছর বয়েসে তিনি সাহিত্যের জাতীয় পুরস্কার পান, হিমেনেথ্ প্রমুখ প্রবীণ কবিরা তাঁকে অভিনন্দন জানান, এবং সেই তরুণ বয়সেই আলবের্তি প্রতিষ্ঠিত কবি। কিন্তু যে-বিষয়ে লিখে সার্থক হয়েছেন— তাকে অবলীলায় পরিত্যাগ করে বিষয়ান্তরে যেতে কোনো কবিরই দ্বিধা হয় না। সমুদ্র ছেড়ে আলবের্তি এলেন স্থলভাগে। কোনো সমালোচক এই দ্বিতীয় স্তরের আলবের্তি সম্পর্কে বলেছেন, 'স্থলে ভ্রাম্যমাণ তরুণ ইউলিসিস।' নিঃসঙ্গ দেবদূতের মতো তিনি অচেনা মানব সমষ্টির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করার চেষ্টা করেছেন।

আলবের্তির জন্ম সাল ১৯০২। প্রথম যৌবন স্পেনের বিভিন্ন অঞ্চলে এবং মাদ্রিদে কাটলেও পরবর্তী দীর্ঘ জীবন কাটে প্রবাসে, নির্বাসনে। শীতের সময় মানস সরোবর ছেড়ে আসা পাখিদের মতো, স্পেনের গৃহযুদ্ধের সময় ফ্রাঙ্কোপন্থীদের বিজয়কালে, দলে দলে কবি দেশ ছেড়ে নির্বাসনে চলে যান, অনেকেই আর ফিরতে পারেননি। নিরাশা, অত্যাচার এবং কবি বন্ধুদের মৃত্যু দেখে (লোরকা ছিলেন আলবের্তির ঘনিষ্ঠ সুহৃদ) প্রথম দিকে খুবই মুষড়ে পড়েছিলেন তিনি। ভেবেছিলেন, আর কবিতা লিখবেন না। পরে, দেশের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার একমাত্র উপায় হিসেবে, দূর থেকে দীর্ঘশ্বাসের মতন কবিতা লিখে পাঠিয়েছেন স্পেনের উদ্দেশ্যে। মাতৃভাষার প্রতি স্প্যানীশ লেখকদের টান এত প্রবল যে প্যারিস বা লণ্ডনে তাঁরা নির্বাসন নেননি, অনেকেই গিয়েছিলেন দক্ষিণ আমেরিকা, কিংবা মেক্সিকোয় যেখানে স্প্যানীশ ভাষা চলে। দীর্ঘ পঁচিশ বছর বুয়েনস এয়ারিসে কাটাবার পর আলবের্তি এখন ইতালিতে আছেন, মাতৃভূমির কাছাকাছি।

কবিতার বহিরঙ্গে প্রথাগত ফর্ম এবং প্রাচীন ছন্দের পুনরুদ্ধার করলেও আলবের্তি মনে প্রাণে একজন সুরলিয়ালিস্ট।]

সংখ্যার দেবদূত

কুমারীদের সঙ্গে টি স্কোয়ার,
কম্পাস, নজর রাখে
অন্তরীক্ষের ব্ল্যাক বোর্ডে।

এবং সংখ্যার দেবদূত
ভাবুক, উড়ে যায়
১ থেকে ২, ২ থেকে
৩, ৩ থেকে ৪-এ।

ঠাণ্ডা চক এবং স্পঞ্জ
ঘষে দেয়, মুছে দেয়
মহাশূন্যের আলো।
না সূর্য চাঁদ, না তারা

না বজ্র বিদ্যুতের
আকস্মিক সবুজ,
না বাতাস, শুধু কুয়াশা।

কুমারীদের সঙ্গে টি স্কোয়ার নেই
কম্পাস নেই, কাঁদছে।
এবং মৃত ব্ল্যাক বোর্ডের ওপর
সংখ্যার দেবদূত
মৃত, ঢেকে শোয়ানো
১ এবং ২-এর ওপরে,
৩-এর ওপরে, ৪-এর ওপরে···

দেবদূতের প্রত্যাগমন

যাকে আমি চেয়েছিলাম, সে ফিরে এসেছে,
যাকে আমি ডেকেছিলাম।
সে নয়, যে মুছে নেয় নিরস্ত্র আকাশ
নিরাশ্রয় তারা,
দেশহীন চাঁদ,
তুষার।
একটি হাত থেকে ঝরে পড়ে যে তুষার
একটি নাম
একটি স্বপ্ন
একটি কপাল

সে নয়, যার চুলের সঙ্গে
বাঁধা আছে মৃত্যু।
আমি যাকে চেয়েছি
বাতাস ছিন্নভিন্ন না করে
পাতাদের আহত না করে, জানলার শার্সি না কাঁপিয়ে
সে আসবে, যার চুলের সঙ্গে
বাঁধা আছে নিস্তব্ধতা।
সে আমাকে আঘাত না দিয়ে খুঁড়ে তুলবে
আমার বুকের মধ্যে এক মিষ্টি আলোর ভাণ্ডার
এবং নৌবাহনযোগ্য করবে আমার আত্মাকে।

[প্রথম কবিতায়, এই বিশ্বের সুর সঙ্গীত যে এলোমেলো ভাবে ভেঙে যাচ্ছে, তারই তির্যক উল্লেখ। দ্বিতীয় কবিতায় মানুষকে শান্তি দিতে একজন দেবদূতের পুনরাগমন। যুদ্ধ, নিষ্ঠুরতা, লোভ, অন্ধকারের পরেও এক একজন দেবদূত আসে নিস্তব্ধতার বন্দনা শোনাতে। দেবদূত, অর্থাৎ কবি। কবিই ইচ্ছে করলে অন্ধকার জাগাতে পারে, আবার তারই হাতে উদ্ভাসনের অধিকার।]

পাবলো নেরুদা
সোনাটা

যদি আমায় প্রশ্ন করো, কোথায় আমি ছিলাম, তবে
আমি বলবো, "এই রকমই হয়ে থাকে।"
আমি তখন পাথর-ঢাকা মাটির কথা বলতে বাধ্য,
বলতে হবে নদীর কথা ধৈর্য যাকে ধ্বংস করে ;
আমার জানা শুধুই যে-সব পাখির ত্যক্ত
পিছনে ফেলা সাগর কিংবা এখন আমার বোনের কান্না।
কেন রয়েছে এত জগৎ, কেন প্রতিটি দিনের সঙ্গে
অন্য দিন সুতোয় বাঁধা ? কেন একটি আঁধার রাত্রি,
মুখের মধ্যে ভরে উঠেছে ? কেন মৃত্যু ?
যদি আমায় প্রশ্ন করো, কোথা থেকে যে এসেছি আমি—
আমাকে কথা বলতে হবে ভাঙা জিনিসের
বলতে হবে তিক্ত আসবাবের কথা
কথা বলবো, কখনো পচা, বিশাল বিশাল প্রাণীর সঙ্গে
কথা বলবো আমার কাতর বুকের কাছে।
যা কিছু যায় হৃদয় ঘুরে সকলই নয় স্মৃতির ছায়া
বিস্মৃতিতে ঘুমোয় এক বাদামী পায়রা, সেও তো নয়,
কিন্তু কান্নাসিক্ত মুখ
গলার কাছে আঙুল
আর যা পাতা ঝরায়, তাদের ছায়া ;
দিনের কালো মিলিয়ে যায়
আমাদের এই দুঃখী রক্তে প্রতিপালিত একটি দিন।
এখনও আছে মাধবীফুল, ইষ্টকুটুম পাখির ডাক
এসব দেখে ভালোই লাগে, এসব দেখি মিষ্টি শখের
ছবির কার্ডে
যেন সময় মধুরতার দু হাত ধরে ঘুরে বেড়ায়।

এসব দাঁত ছাড়িয়ে আরও গভীরে যাওয়া ভালো না
নৈঃশব্দের ঢাকনাটাকে কামড়ে ছেঁড়া ভালো না
কারণ আমি জানি না ঠিক কি উত্তর দেবো :
এত মৃত্যু। চতুর্দিকে কত মৃত্যু
সমুদ্রের কত দেয়ালে চিড় ধরালো লাল সূর্যের আলো
কত না মাথা নৌকোর গায় ধাক্কা মারলো
কত না হাত দু হাত ভরা চুমু রেখেছে
কত কিছুই আমি এখন ভুলতে চাই।

এখন আমি লিখতে পারি

আজ রাতে আমি লিখে যেতে পারি দুঃখিততম কবিতা

ধরা যাক লিখি : "আকাশ তারায় সাজানো
তারা, নীল তারা, কাঁপে দূর মহাশূন্যে।"

রাত্রির হাওয়া ঘুরে ঘুরে আসে, মহাকাশে গান গায়।

আজ রাতে আমি লিখে যেতে পারি দুঃখিততম কবিতা
আমি তাকে খুব ভালোবাসতুম,
সেও কোনোদিন আমায় বেসেছে ভালো
এরকমই কোনো রাতে আমি তাকে
দুই হাত ভরে জড়িয়ে রেখেছি।
আকাশের নিচে কত অসংখ্য চুম্বন করেছিলাম ওষ্ঠে।

সে আমায় খুব ভালোবেসেছিল,
কোনো কোনোদিন আমিও বেসেছি ভালো
আয়ত শান্ত তার দুই চোখ ভালো না বাসা কি সম্ভব ?

আজ রাতে আমি লিখে যেতে পারি দুঃখিততম কবিতা
শুধু এই ভেবে, সে তো কাছে নেই, হারিয়েছি তাকে আমি।

কান পেতে শুনি বিশাল রাত্রি
তাকে ছাড়া আরও বিপুল বিশাল
কবিতা আমার বুকের ভিতরে ঝরে ঝরে পড়ে,
ঘাসের উপরে শিশিরের মতো।

আমার প্রণয় তাকে কাছে ধরে রাখতে পারেনি,
কিবা আসে যায়
রাত্রি এখন তারায় তারায়, সে আমার কাছে আজ নেই আর ।

এই সব শেষ । দূর থেকে যেন গান গায় কেউ, খুব দূর থেকে
তার বিচ্ছেদে আমার হৃদয় একটুখানিকও পূর্ণ হয়নি ।

যেন তাকে কাছে টেনে নিতে চাই,
আমার দৃষ্টি খুঁজে ফেরে তাকে
আমার হৃদয় খুঁজে ফেরে তাকে,
সে আমার পাশে আজ আর নেই ।

আমি তাকে ভালবাসি না এখন,
একথা সত্যি, তবু কত ভালোবেসেছি তাকে
আমার কণ্ঠ বাতাস খুঁজেছে, তার শ্রবণের কাছে পৌঁছোতে ।

অপরের । আজ সে তো অপরের । যেমন আমার চুম্বন নিতো
তার স্বর, তার সরল শরীর, অনাদি চক্ষু সবই অপরের
আমি তাকে ভালোবাসি না এখন, হয়তো এখনো ভালোবাসতুম
ভালোবাসা কত সামান্য, আর বিস্মৃতি এর বিপুল দীর্ঘ

এরকমই কোনো রাতে আমি তাকে
দুই হাত ভরে জড়িয়ে রেখেছি
তার বিচ্ছেদে আমার হৃদয় একটুখানিকও পূর্ণ হয়নি ।

এই শেষবার তার ব্যথা আমি হৃদয়ে পেলাম
আমার জীবনে তার উদ্দেশে এই কবিতাই শেষবার লেখা ।

[পাবলো নেরুদার জন্ম-সাল ১৯০৪, দক্ষিণ আমেরিকার চিলিতে। স্বদেশপ্রেম ও মানবতা সম্পর্কে তাঁর সরল ও জোরালো কবিতাবলীর জন্যই তিনি বিখ্যাত। বাংলায় তাঁর কবিতা আগে অনেকগুলি অনূদিত হয়েছে। দ্বিতীয় কবিতাটি বিষয়ে জ্ঞাতব্য এই, একটি নারী যে কবিকে ছেড়ে চলে গিয়েছিল, তাকে উদ্দেশ করে লেখা ২০টি কবিতার সিরিজে এইটিই শেষ কবিতা।]

নিকোলাস গিলেন

[আমেরিকায় সম্প্রতি যে নতুন করে নিগ্রো স্বাধিকার আন্দোলন শুরু হয়েছে, সেই পরিপ্রেক্ষিতে নিকোলাস গিলেন রচিত নিগ্রোদের বিষয়ে একটি মর্মান্তিক কবিতা এখানে অনুবাদ করা হয়তো অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

নিকোলাস গিলেন-এর জন্ম ১৯০২ সালে, কিউবায়। কিউবার তিনি প্রখ্যাত কবি এবং সমগ্র স্প্যানীশ কবিতাতেও তাঁর স্থান উল্লেখযোগ্য। তাঁর রচনা অনেকটা চারণ কবিতাসুলভ, আন্তরিকতায় এবং ছন্দ ও ধ্বনি মাধুর্যে খুবই প্রফুল্ল। স্পেনের প্রখ্যাত দার্শনিক ও কবি উনামুনো এক সময় নিকোলাস গিলেনকে লিখেছিলেন, 'আমি আপনার কবিত্ব প্রতিভায় এবং শব্দের উপর অধিকার দেখে অভিভূত হয়ে পড়েছি। আপনার কবিতা পড়েই আমি নিগ্রোদের কথায় সুর ও ছন্দ বুঝতে শুরু করেছি।'

এই কবিতাটি যে-সময়ে লেখা, তখনও কিউবা আমেরিকার মিত্রতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কম্যুনিস্ট ঘেঁষা রাষ্ট্রে পরিণত হয়নি। আমেরিকার সঙ্গে কিউবার তখন ঘনিষ্ঠ যোগ থাকার ফলে, আমেরিকার নিগ্রোদের দুঃখের সঙ্গে কিউবার একাত্মবোধ ছিল। কবিতায় বর্ণিত নিগ্রোদের দুরাবস্থার সঙ্গে এখনকার নিগ্রোদের অবস্থার বিশেষ কোনো তফাত নেই। তবে নিগ্রোরা এখন পেয়েছে আইন অনুযায়ী সমান অধিকার এবং আমেরিকার প্রেসিডেন্টের সমর্থন।]

নিগ্রো

একটি ব্লুজ পাঠিয়ে দিল ছন্দময় আর্তনাদ
চমৎকার ভোরের দিকে।
লিলি শুভ্র দক্ষিণ তার চাবুক নিয়ে বেরিয়ে এল,
ভাঙলো তাকে।
কচি নিগ্রো ছেলেমেয়েরা ইস্কুলে যায়, সঙ্গে তাদের
ঘিরে রয়েছে শিক্ষা বন্দুক।
যখন তারা ক্লাসের মধ্যে ঢুকবে এসে
তারা দেখবে জিম ক্রো স্বয়ং তাদের শিক্ষক
লিঞ্চ নামে সেই জজ সাহেবের ছেলেমেয়েরাই অন্য ছাত্র;
প্রত্যেকটি নিগ্রো শিশুর দেরাজে থাকবে
কালির বদলে তাজা রক্ত
পেন্সিল নয় জ্বলন্ত কাঠ।

এই তো দক্ষিণ, এখানে কখনো চাবুকের শিস থেমে থাকে না।
সেই অত্যাচারিত জগতে
সেই কর্কশ, গ্যাংগ্রিন হওয়া অসহ্য আকাশের নিচে
নিগ্রো শিশুরা
সাদা শিশুদের পাশে বসে লেখা পড়া করতে পারবে না।
তারা তো শান্তভাবে বাড়িতে বসে থাকলেই পারে—

অথবা—অথবা আর কি পারে কে জানে—
তারা রাস্তা দিয়ে না হাঁটলেই পারে
অথবা তারা পারে চাবুকের তলায় আত্মসমর্পণ করতে
অথবা বেছে নিতে পারে বন্দুক অথবা থুতুর নিচে মৃত্যু ;
তারা একটা সুন্দরী মেয়েকে দেখে শিস দিতে পারে
অথবা ভয় পেয়ে, চোখ নিচু করে বলতে পারে, 'হ্যাঁ',
মাথা নিচু করে, 'হ্যাঁ'

এই 'স্বাধীন পৃথিবীতে'— ডালেস যার ঘোষণা করছেন
বিমান বন্দর থেকে বন্দরে, 'হ্যাঁ',
আর, এই সময় একটা সাদা বল
লঘু ছন্দময় ছোট একটা সাদা বল
প্রেসিডেন্টের গলফ খেলার বল— সেই ক্ষুদ্র গ্রহ—
গড়িয়ে যায় নিবিড় ঘাসের ওপর দিয়ে,
সবুজ, পবিত্র, নরম, মসৃণ ঘাস, 'হ্যাঁ' ।
তা হলে এবার,
ভদ্র মহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ, তরুণী যুবতীরা,
শিশু
এবং বৃদ্ধ—টাক অথবা চুলো মাথা, এবার
ইণ্ডিয়ান, নিগ্রো, মুলাটো, সঙ্কর, এবার
এবার একবার ভেবে দেখুন
যদি সমস্ত পৃথিবীটাই হতো দক্ষিণ অঞ্চল
যদি সমস্ত পৃথিবীটাই হতো চাবুক এবং রক্ত
যদি সমস্ত পৃথিবীতেই সাদা মানুষদের জন্য সাদা ইস্কুল
যদি সমস্ত পৃথিবীটাই হতো পাথর আর খুদের দল
যদি সমস্ত পৃথিবীটাই হতো ইয়াঙ্কি আর অত্যাচার
ভাবুন সেই মুহূর্ত একবার
অন্তত একবার তা কল্পনা করে দেখুন !

[এ কবিতায় 'দক্ষিণ' বলতে, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণের চারটি প্রদেশ— মিসিসিপি, জর্জিয়া, অ্যালাবামাও ভার্জিনিয়া—এদের বোঝায় । নিগ্রোদের প্রতি অত্যাচার এখানেই সবচেয়ে প্রবল এবং অনবরত ।

ব্লুজ—নিগ্রোদের লোকগীতি । এর সুর হয় ঢিমে লয়ের জ্যাজ—এবং এ গানের কথা সব সময়েই খুব করুণ । জিম ক্রো— একটি প্রাচীন নিগ্রো গান । এখন এই একটি মাত্র শব্দে—নিগ্রোদের প্রতি সমস্ত অত্যাচার ও বৈষম্য বোঝায় ।

লিঞ্চ কথাটার মানে কোনো লোককে বিনা বিচারেই জনতা কর্তৃক হত্যা । শব্দটি তৈরি হয়েছে, অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভার্জিনিয়ার দুজন ম্যাজিস্ট্রেট, কর্নেল চার্লস লিঞ্চ আর ক্যাপ্টেন উইলিয়াম লিঞ্চ

এদের নাম থেকে। এই দুজন বিচারক কোনো আইন না মেনেই অভিযুক্ত ব্যক্তিটিকে (অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিগ্রো) জনতার হাতে তুলে দিতেন ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে মেরে ফেলার জন্য। বিমান বন্দরে ডালেসের ঘোষণা— এর মর্মার্থ, আমেরিকার বিমান বন্দরে, কোনো বিদেশি পদার্পণ করলেই তার হাতে একটি ছাপানো শুভেচ্ছা বাণী তুলে দেওয়া হয়, যার বক্তব্য, এই স্বাধীন দেশে সকল ধর্ম, বর্ণ ও জাতির সমান অধিকার। ইণ্ডিয়ান—আমেরিকার আদিম অধিবাসী 'রেড ইন্ডিয়ান'দের ডাকনাম।

মুলাটো— অর্থাৎ কোনো নিগ্রো আর ককেশিয়ান— অর্থাৎ সাদা মানুষের মিলনের ফলে জাত সন্তান। অর্থাৎ যাদের গায়ের রং কিছুটা হাল্কা, প্রায় ফর্সা।]

অকটাভিও পাজ

[অকটাভিও পাজের জন্ম মেক্সিকোতে, ১৯১৪, শিক্ষা মেক্সিকো ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে। মেক্সিকোর সাহিত্য আন্দোলনে মুখ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন, আঁদ্রে ব্রেতোঁ তাকে বলেছেন, দ্বিতীয় যুদ্ধের পরবর্তী সবচেয়ে খাঁটি কবি। তিনি এখন ভারতবর্ষে মেক্সিকোর রাষ্ট্রদূত, দিল্লীতে থাকেন।]

নীল উপহার

যখন জেগে উঠলাম, ঘামে আমার সর্বাঙ্গ ভেজা। আমার ঘরের মেঝে সদ্য ধোয়া, লাল ইঁট, থেকে উঠে আসছে উষ্ণ কুয়াশা। একটা মথ বাল্‌বের চারপাশে ঘুরছে, আলোয় বিভ্রান্ত হয়ে। আমি খাট থেকে নেমে খালি পায়ে সাবধানে হেঁটে এলাম, যাতে না একটা কাঁকড়াবিছেকে মারিয়ে দিতে হয়। জানলার কাছে দাঁড়িয়ে আমি ঘুমন্ত প্রান্তর থেকে ভেসে আসা হাওয়ায় নিশ্বাস নিই। আমি শুনতে পাই রাত্রির গভীর, রমণী নিশ্বাস। তারপর আমি বাথরুমে গিয়ে বেসিনে জল ঢেলে তোয়ালেটা ভিজিয়ে নিলাম। ভিজে তোয়ালে দিয়ে আমি আমার বুক ও পা মুছে, খানিকটা শুকনো হয়ে, পোশাক পরতে শুরু করি, আগে দেখে নিই জামাকাপড়ের ভাঁজে ছারপোকাটোকা লুকিয়ে আছে কিনা। হালকা পায়ে সবুজ রং করা সিঁড়ি বেয়ে নেমে এসে হোটেল ম্যানেজারের মুখোমুখি পড়ে যাই। লোকটির এক চোখ কানা, দুঃখী, স্বল্পভাষী মানুষ, সে একটা দড়ির চেয়ারে বসে সিগারেট টানছিল চোখ বুজে।

সে ভালো চোখটা খুলে আমার দিকে তাকালো। শুকনো গলায় প্রশ্ন করলো, কোথায় যাচ্ছেন, সেনর ?

—একটু বেড়িয়ে আসি। আমার ঘরের মধ্যে বড় গরম।

—কিন্তু এখন তো সব বন্ধ। আমাদের এখানে রাস্তায় আলো থাকে না। আপনার ঘরে থাকাই ভালো।

আমি কাঁধ ঝাঁকিয়ে নিম্নস্বরে বললুম, 'এখুনি ফিরে আসবো।' অন্ধকারে বেরিয়ে এলাম। প্রথমটায় আমি কিছুই দেখতে পেলাম না। পাথর-বাঁধানো রাস্তা দিয়ে সোজা খানিকটা হেঁটে আমি সিগারেট ধরাবার জন্য দাঁড়ালাম। হঠাৎ একটা কালো মেঘের পেছন থেকে বেরিয়ে এলো চাঁদ, উদ্ভাসিত করে তুললো একটা জল-হাওয়া-জর্জর দেয়াল। সেই বিপুল সাদায় আমার প্রায় চোখ ঝলসে গিয়েছিল। ঝুরুঝুরু বাতাস দুলে উঠলো, আমার নাকে ভেসে এলো তেঁতুলগাছের গন্ধ। রাত্রির মধ্যে পাতার খসখসানি ও কীটের গুঞ্জন। চোখ তুলে তাকালাম উঁচুতে, এখন নক্ষত্রও ফুটে উঠছে। আমার মনে হলো, এই বিশ্ব একটি বিশাল সঙ্কেত প্রকল্প, বিশাল অস্তিত্বের কথোপকথন— আমার কান, ঝিঁঝির ডাক, তারার মিটমিটানি— এগুলি সবই আসলে সেই সংলাপের যতি, পর্ব, অসম তাল। আমি একটি মাত্র শব্দের একটি মাত্র সিলেবল। কিন্তু সেই শব্দটা কি ? কে সেই শব্দ উচ্চারণ করছে ? কাকে ? আমি সিগারেটটা রাস্তার পাশে ছুঁড়ে দিলাম, সেটা জ্বলন্ত অর্ধবৃত্তে ধূমকেতুর ছোট সংস্করণের মতো ঘুরে পড়লো। আমি অনেকক্ষণ ধরে

হাঁটলাম। নিজেকে নিরাপদ এবং মুক্ত মনে হলো, কারণ সেই বিশাল ওষ্ঠ আমাকে এমন স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করছে, এমন সুখে। রাত্রি একটি চক্ষুর উদ্যান।

যখন একটা রাস্তা পার হচ্ছিলাম, বুঝতে পারলুম, কেউ যেন একটা দরজা দিয়ে বেরিয়ে এলো। ফিরে তাকিয়ে কারুকে দেখতে পেলাম না। দ্রুত হাঁটতে শুরু করি। একটু পরেই পাথরের ফুটপাতে লোহা-পরানো জুতোর শব্দ। পিছন ফিরে তাকাইনি, যদিও অনুভব করছি একটা ছায়া আমার কাছাকাছি এগিয়ে আসছে। দৌড়োবো ভেবেছিলাম, পারিনি। হঠাৎ আমি থেমে গেলাম। কেন জানি না। আমি আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলাম কিন্তু তক্ষুনি আমার পিঠে একটা ছুরির তীক্ষ্ণ ফলার স্পর্শ টের পেলাম। একটি চাপা কণ্ঠস্বর, 'নড়বেন না, সেনর, তা হলেই কিন্তু মৃত্যু।'

মাথা না ঘুরিয়েই আমি বললাম, 'তুমি কি চাও ?'

'আপনার চোখ, সেনর।' লোকটির গলা অদ্ভুত রকমের ভদ্র, যেন কিছুটা অপ্রস্তুত।

'আমার চোখ ? আমার চোখ নিয়ে কি করবে ? দেখো, আমার কাছে কিছু টাকা আছে, খুব বেশি নয় যদিও, তা সবই আমি তোমাকে দিয়ে দিচ্ছি। আমাকে ছেড়ে দাও, আমাকে মেরো না।'

'না, না, সেনর, আমি আপনাকে খুন করতে চাই না, আমি শুধু আপনার চোখ দুটো চাই।'

'কেন ?'

'আমার বান্ধবীর একটা শখ। সে এক গুচ্ছ নীল চোখের স্তবক চায়। বেশি লোকের তো ও রকম নেই।'

'তা হলে আমার দুটো দিয়েও কাজ হবে না। ও চোখ নীল নয়, ধূসর।'

'আমাকে ভোলাবার চেষ্টা করবেন না। আমি জানি আপনার নীল চোখ।'

'কিন্তু, আমরা খ্রীস্টান হে ! তুমি হঠাৎ আমার চোখ দুটো তুলে নিতে পারো না। আমি আমার কাছে যা আছে সব দিচ্ছি।'

'শুধু শুধু গণ্ডগোল করবেন না', তার কণ্ঠ এবার কর্কশ, 'ফিরে দাঁড়ান।'

আমি ফিরে দাঁড়ালাম। বেঁটে রোগা লোকটা, তালপাতার টুপিতে অর্ধেক মুখ ঢাকা। ডান হাতে একটা লম্বা ছুরি, চাঁদের আলোয় ঝকমক করছে।

'মুখের সামনে একটা দেশলাই জ্বালুন।'

আমি দেশলাইয়ের একটা কাঠি জ্বেলে মুখের সামনে ধরলাম। আলোর জন্য আমার চোখ বন্ধ হয়ে এলো, কিন্তু সে আঙুল দিয়ে আমার চোখের পাতা খুলে দিল। সে ভালো করে দেখতে পাচ্ছিল না, সে গোড়ালিতে ভর দিয়ে উঁচু হয়ে উঁকি মারলো। দেশলাইকাঠি পুড়ে শেষ হয়ে আসায় আঙুল জ্বালা করতেই ছুঁড়ে ফেলে দিলাম। সে একটুক্ষণ চুপ।

'এখন দেখলে তো ? আমার চোখ নীল নয়।'

'আপনি বড় চালাক, সেনর। আর একটা কাঠি জ্বালুন।'

আমি আর একটা কাঠি জ্বেলে চোখের খুব কাছে ধরলাম। সে আমার জামা টেনে বললো, 'নিচু হয়ে বসুন।'

আমি হাঁটু গেড়ে বসলাম। সে আমার চুলের মুঠি ধরে মাথাটা পেছনে হেলিয়ে দিল। তারপর সে আমার ওপর ঝুঁকে তাকিয়ে রইল একদৃষ্টে, ছুরিটা কাছে এগিয়ে এলো, আরও কাছে, ছোঁয়া লাগলো আমার চোখের পাতায়। আমি চোখ বুজলাম।

'চোখ খুলে তাকান !' সে বললো, 'পুরোপুরি !'

আমার চোখ চাইলাম। দেশলাইয়ের আগুনে পুড়ে গেল আমার চোখের পাতা। হঠাৎ সে আমায় ছেড়ে দিল।

'নাঃ, নীল নয় ! মাপ চাইছি আমি।' দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে এই কথা বলে সে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

মিলারেস ও দে লা সিলভা

[স্প্যানীশ কবিতা প্রসঙ্গে আমরা মূল স্পেন ভূখণ্ড ছাড়াও স্প্যানীশ-ভাষী কিউবা, মেক্সিকো ও দক্ষিণ আমেরিকার কয়েকটি দেশের কবিদের কথা আলোচনা করেছি। এবারে আমরা খুব ছোট দুটি দ্বীপ-দেশের কবিকে উপস্থিত করছি, যেখানকার ভাষাও স্প্যানীশ। এই কবিদ্বয় তাঁদের স্ব স্ব দেশের বাইরে তেমন পরিচিত নন, কিন্তু এঁদের রচনার সরলতা ও আবেগের তীব্রতা সর্বজনীন।

অগাস্টান মিলারেসের জন্ম ক্যানারি দ্বীপপুঞ্জে, ১৯১৭ সালে। ক্যানারি দ্বীপপুঞ্জের অবস্থান ঠিক কোথায়, পাঠকের যদি এই মুহূর্তে মনে না পড়ে তবে জানাই, উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকার উপকূলের কাছাকাছি দ্বীপ-সমষ্টি ক্যানারি, জনসংখ্যা মাত্র সাড়ে পাঁচ লক্ষ।

সলোমন দে লা সিলভার জন্ম ১৮৯৩ সালে নিকারাগুয়ায়। নিকারাগুয়া মধ্য আমেরিকায় ক্যারিবিয়ান আর প্রশান্ত মহাসাগরের মাঝখানে ছোট্ট দেশ, লোকসংখ্যা এগারো লক্ষ। সলোমন দে লা সিলভা জীবনে অনেক কাজ করেছেন, উপন্যাস, কবিতা ও সাংবাদিকতা ছাড়াও যুদ্ধ করেছেন, শ্রমিক আন্দোলন গড়েছেন ও রাজনীতিতে যোগ দিয়েছেন। শেষ পর্যন্ত তিনি প্যারিসে নিকারাগুয়ায় রাষ্ট্রদূত ছিলেন, ঐখানেই ১৯৫৯ সালে তাঁর মৃত্যু।]

অগাস্টান মিলারেস
শুভেচ্ছা

আমি, একজন কবি, ঘোষণা করছি যে কবিতা
শুধু মানুষের সত্য অস্তিত্বের প্রকাশ,
কবিতা শুধু সত্যের গান, তাকে জাগিয়ে তোলা
যে দৈত্য দিবা রাত্রি পাপ সৃষ্টি করে যাচ্ছে, তার বিরুদ্ধে।

কবির কণ্ঠই একমাত্র পৃথিবীকে মুক্ত করতে পারে
সেই ঊষাকে ভেদ করে জেগে ওঠা প্রথম শিখর
সেই পাহাড়েই ধ্বনিত হয় সময়ের সঙ্গীত
তার হৃদয়ই প্রথম ছিন্নভিন্ন হয় যে-কোনো যুদ্ধে

প্রথম সারিতে তার স্থান কখনই অস্বীকার করা যাবে না
স্বপ্নদ্রষ্টা মানুষের সঙ্গে তার আত্মীয়তা তাকে সেই স্থান দিয়েছে
একজন কবি সব সময়েই সেই মানুষের সঙ্গী
যারা যুদ্ধের সময় নির্ভীকভাবে ঝাঁপ দেয়

কবিই মৃত্যুরোধকারী জনতার প্রতিনিধি—
আকস্মিক রাত্রে যখন সব কিছুই বিস্মৃত
যখন কোথাও কোনো স্বাধীনতা নেই, কোনো জীবিত কবি নেই
তখন বাতাস না থাকায় পাখিরা ওড়ে না।

আমি, একজন কবি, ঘোষণা করছি আমার ক্রোধ
যখন শাসানি আসে স্বাধীনতার প্রতি, আমাদের উষ্ণকারী সূর্যের প্রতি।
পৃথিবী ঠাণ্ডা হয়ে এলে কবিও উত্তাপহীন হয়ে যায়
পৃথিবীতে তখন হৃদয় নেই, সুবিচার নেই।

আমি, একজন কবি, ঘোষণা করছি আজকের দিনের
কর্কশ পথে একজন কবিকেই মানুষ তার ভাই বলে চিনবে।
আমি, একজন কবি, ঘোষণা করছি যে একজন কবিই সত্যিকারের মানুষ
যদিও কখনো কখনো সে আমাদের বোঝাতে যায় যে সে দেবতা।

সালোমন দে লা সিলভা
বুলেট

যে বুলেট আমাকে হত্যা করবে
সেই বুলেটেরও প্রাণ থাকবে

এই বুলেটের আত্মা হবে একটি গোলাপের মতো
যদি ফুল গান গাইতে পারে :
অথবা সে হবে হলদে মুক্তার সৌরভ
যদি রত্নেরও সৌরভ থাকে :
অথবা সে হবে সঙ্গীতের শরীরের ত্বক
যদি আমাদের হাত দিয়ে
নগ্ন সঙ্গীতকে স্পর্শ করা সম্ভব হতো।

যদি সেই বুলেটটি এসে আমার মাথায় আঘাত করে
তবে সে বলবে, "আমি দেখছিলাম তোমার ভাবনা কত গভীর।"
যদি সে ঢুকে যায় আমার হৃৎপিণ্ডে
তবে সে বলবে, "আমি শুধু তোমাকে দেখাতে চাই,
আমি তোমাকে কতখানি ভালোবাসি।"

রুশ কবিতা : প্রতীক্ষিত ক্রান্তিকাল

১৯১৭ সালের বিপ্লব রাশিয়ার জীবনযাত্রা, ইতিহাস সব কিছু অকস্মাৎ বদলে দেয়, সাহিত্যের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে ধারণারও পরিবর্তন শুরু হয়। কিন্তু বিপ্লব-পরিকল্পনার অনেক আগে থেকেই রাশিয়ার সাহিত্যে একটা আমূল পালাবদল প্রতীক্ষিত ছিল।

গত শতাব্দীর প্রথম খণ্ডেই রুশ কবিতার স্বর্ণ-যুগের অভ্যুদয় ও অবসান। এই স্বর্ণ যুগের সম্রাট ছিলেন পুশকিন, এ ছাড়া প্রায় কাছাকাছি প্রতিভাধর জুকভস্কি এবং ব্যাটিয়োস্কভ। পুশকিন একই সঙ্গে সাম্রাজ্য ও স্বাধীনতার সভাকবি, তিনি রাশিয়ার লোকসঙ্গীত, পল্লীগাথার সঙ্গে মিলিয়েছিলেন সমগ্র ইওরোপীয় ঐতিহ্যের শ্রেষ্ঠ ফসল, তাঁর অবিশ্বাস্য ক্ষমতাবলে রুশ কবিতা হয়ে ওঠে একই সঙ্গে মন্দাকিনী ও ফল্গু। রাজনৈতিক কবিতা রচনার জন্য তিনি নির্বাসিত হয়েছিলেন, সেই নির্বাসন তাঁর ক্ষেত্রে সুফলা হয়েছিল, নির্বাসনকালে লেখা তাঁর দীর্ঘ-কবিতাবলীতে রোমান্টিসিজম, সৌন্দর্যবন্দনা এবং বাস্তবতার অপূর্ব সমাহার দেখা যায়।

১৮৩৭ সালে পুশকিনের মৃত্যুর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই রুশ কবিতার স্বর্ণ যুগের অবসান হয় বলা যায়। পুশকিনের সময় আর একজন বিপ্লবী তরুণ, লেরমেনটফ কবিতায় বিদ্রোহ আনার চেষ্টা করেছিলেন ঠিকই, বাসনার তীব্রতা এবং অহংকৃত নৈঃসঙ্গ ফুটে উঠেছিল লেরমেনটফের কবিতায়, কিন্তু মাত্র সাতাশ বছরে তাঁর মৃত্যু অকস্মাৎ সেই বিপ্লবে ছেদ এনে দেয়। পুশকিন কবিতার সঙ্গে সঙ্গে চমৎকার গদ্যকাহিনীও লিখেছেন, তখনকার রাশিয়ার সেই কিশোর-গদ্য ক্রমে অতিকায় দানবের রূপ নিয়ে জেগে ওঠে, কবিতাকে দমন করে গদ্যের এমন প্রভুত্ব গত শতাব্দীতে পৃথিবীর আর কোথাও দেখা যায়নি। ১৮৪০-এর পর অনেকেরই ধারণা হয়েছিল যে রাশিয়ায় কবিতার দিন শেষ হয়ে গেছে। পুশকিন এবং গোগোলের গদ্য রচনা অসম্ভব জনপ্রিয় হয়ে ওঠে, পরবর্তী দু' তিন দশকে আস্তে আস্তে দেখা দিলেন, ডস্টয়েফস্কি, টুর্গেনিফ, গনচারফ এবং টলস্টয়। তখন আর কবিতা কে পড়ে! এঁদের রচনায় সামাজিক বাস্তবতা এমন মর্মভেদী এবং সত্য হয়ে দেখা দেয় যে, তখন বহু সমালোচক কবিতার বিরুদ্ধে অস্ত্র তুলে ধরে বলেছিলেন যে, সে-সব কবিতা লেখার কোনোই মানে হয় না, যার সঙ্গে সামাজিক বাস্তবতার কোনো সম্পর্কই নেই! এমন কি, একজন সমালোচক এ-সময় বলেছিলেন, একজোড়া জুতোর দামের চেয়েও শেক্সপীয়রের রচনাবলী কম মূল্যবান! টলস্টয়ও লিখেছিলেন, শেক্সপীয়রের রচনা শুধু মাতাল, বেশ্যা আর খুনোখুনিতে ভর্তি, ওর মধ্যে কোনো সাহিত্য নেই। ফলে এই সময় কবিতা খানিকটা মুখচোরা হয়ে পড়ে। সমাজের অনুশাসন মেনে কিংবা নিছক দেশের উপকারের জন্য কবিরা কখনো কলম ধরতে চাননি, কখনো হৃদয় খুঁড়ে বেদনা জাগাতে রাজী হননি। ফলে রাশিয়ায় সেই সময় কবিতা নিষ্প্রভ হয়ে গদ্যের উদ্ভাসিত জ্যোতি প্রত্যক্ষ করে। তারপর সিম্বলিস্টরা এসে এই প্রায়ান্ধকারের

অবসান ঘটায়।

গদ্যের এই জয়যাত্রার যুগে মাত্র দুজন বড় কবির দেখা পাওয়া যায়। এই দুজন দু-দলের প্রতিনিধি। একদল সমাজবাস্তবতাবাদী, অপর দলের তখনও বিশ্বাস আর্ট ফর আর্টস কেস্। এই দ্বিতীয় দল তখন কোণঠাসা, কিছুটা ধিকৃত, এঁদের মধ্যে প্রধান, আফানাসি ফেট— মধুর ললিত ভাষায়, প্রকৃতি, প্রেম ও বিষাদের কবিতা লিখে কিছু লোকের মন জয় করেছিলেন। তবু, ফেট-কে অবশ্য বিপ্লবের বহু আগেই 'রি-অ্যাকশনারি' আখ্যা পেতে হয়েছিল। প্রথম দলের প্রধান কবি নেক্রাসফ প্রভৃত জনপ্রিয়তা পেয়েছিলেন তখনকার গদ্যবাস্তবতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে, নেক্রাসফের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, দেশের দুঃখ-দুর্দশা, সামাজিক অপব্যবহার—এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার জন্যই কবিতা লেখা উচিত। অনুগামীদের তিনি ধমকে বলেছিলেন, 'তোমাকে কবি না হলেও চলবে, কিন্তু তোমাকে দেশের খাঁটি নাগরিক হতেই হবে!'

রাশিয়ার কবিতার জগতে এরকম বিশৃঙ্খলা চলেছিল গত শতাব্দীর শেষ দশক পর্যন্ত। ১৯১৭-র সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর, সাহিত্যকে সমাজবাস্তববাদী হতেই হবে এমন যে দাবি ওঠে, দেখা যাচ্ছে সেটা আকস্মিক বা ঠিক জোর করা নয়, এরকম প্রত্যাশা রাশিয়ায় গত শতাব্দীর মধ্যভাগেই জেগেছিল এবং শুরু হয়েছিল। সে-চেষ্টা অবশ্য ধারাবাহিক হয়নি, বাস্তবতা ও আদর্শের চিৎকারে পুরোপুরি হাঁপিয়ে ওঠার পর ১৮৯০ সালে আবার কবিতায় আধুনিক আন্দোলন শুরু হয়। একদল কবি বাস্তবতার বাড়াবাড়ি অগ্রাহ্য করে— ফিরতে চাইলেন হৃদয় গহনে, সামাজিকের বদলে ব্যক্তিগত দুঃখবোধ, অতীন্দ্রিয় অনুসন্ধান, রহস্যের বন্দনা, ইত্যাদি প্রবেশ করলো কবিতায়। ফ্যাঁ দ্য সিয়েক্‌ল— অর্থাৎ শতাব্দী-শেষের কবিতায় যে চরিত্রলক্ষণ প্রকাশ পেয়েছিল ফরাসী কবিতায়, রাশিয়াতেও তার প্রভাব দেখা গেল, এই আধুনিক আন্দোলনের নাম দেওয়া হয়েছে সিম্বলিজম, বহু শক্তিমান কবির অভ্যুদয় হলো, সমালোচকরা এই পর্বের নাম দিয়েছেন রুশ কবিতার দ্বিতীয় স্বর্ণ যুগ। কিন্তু প্রথম স্বর্ণ যুগের পুশ্‌কিন কিংবা লেরমেনটফের তুল্য মহান শক্তিধর কবি এঁদের মধ্যে একজনও ছিলেন না বলে, একে রুপোলি যুগ বলাই ভালো। রুশ বিপ্লবের আগে পর্যন্ত এই কবিরাই প্রধান স্থান অধিকার করে ছিলেন।

সিম্বলিস্ট আন্দোলনের প্রথম দলের কবিরা, ভাষার তীক্ষ্ণতা, শব্দঝঙ্কার, ছন্দবৈশিষ্ট্য নিয়েই বেশি কারিকুরি দেখিয়েছেন। এঁদের পরবর্তী কবির দলই প্রকৃত অর্থে সিম্বলিস্ট, এঁদের মধ্যে সকলকে ছাড়িয়ে উঁচুতে উঠে আসেন আলেকসান্দার ব্লক, বিংশ শতাব্দীর প্রকৃত রুশ কবিতার তিনিই প্রথম স্তম্ভ।

আলেকসান্দার ব্লক

[বিংশ শতাব্দীর শুরুতে, বিপ্লবের পূব পর্যন্ত রুশ কবিতায় দু'টি পর পর স্পষ্ট সাহিত্য আন্দোলনের বিকাশ দেখা যায়। এই দুটি আন্দোলনেরই জন্ম পশ্চিম ইওরোপের অন্য দুটি দেশে। ফরাসী দেশ থেকে সিম্বলিস্টদের কবিতা ও রচনাদর্শ অনুপ্রাণিত ও পুনরুজ্জীবিত করে রুশ কবিতা, ব্লক, এই ধারার অন্তর্গত। এর কিছু পরেই, ইতালির ফিউচারিস্ট আন্দোলনের ঢেউ-ও এসে পৌঁছায় রাশিয়ায়, এবং এ আন্দোলনের নেতা হিসেবে দেখা দেন মায়াকভ্‌স্কি।

আলেকসান্দার ব্লকের জন্ম ১৮৮০। রাশিয়ার সিম্বলিস্ট কবিদের মধ্যে তিনি শ্রেষ্ঠ, আজ পর্যন্ত রুশ কবিতায় তাঁর প্রবাহ অপ্রতিরোধ্য। বোদলেয়ার, মালার্মের প্রভাবে রাশিয়ায় সিম্বলিস্ট কবিরা জেগে ওঠেন। বোদলেয়ার প্রচারিত করেসপণ্ডেন্স অর্থাৎ লৌকিক ও অলৌকিক জগতের মধ্যে একটা সত্য যোগসূত্র আছে, একমাত্র কবিরাই ব্যক্তিগত প্রতীকে তা প্রকাশ করতে পারেন, রুশ কবিরাও এ ধারণা গোড়ার দিকে মেনে নিয়েছিলেন। পরে কবিদের নিজস্ব প্রতিভায় তা অনন্যতা পায়। তিনি কবিতায় সুরের সর্বাত্মক প্রাধান্য বিশ্বাস করতেন।

১৯১৭-র বলশেভিক বিপ্লবে তিনি উৎসাহের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন, বস্তুত ১৯০৫ সাল থেকেই বিপ্লবের প্রস্তুতি ও প্রচেষ্টার সঙ্গে তিনি জড়িত ছিলেন। বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে তিনি শান্তি ও সঙ্গীতময় জগৎ পেয়ে যাবার আশা করেছিলেন। কিন্তু বিপ্লবের ঠিক পরেই যে অবধারিত বিশৃঙ্খলা ও রাজনৈতিক দুর্যোগ দেখা যায়, তাতে তিনি বিষণ্ণ হয়ে পড়েন। দেশের কোথাও তখন সুরের উপযোগী আবহাওয়া নেই, সুতরাং শেষ জীবনে তাঁরও বুক থেকে সুর হারিয়ে যায়, কবিতা লেখার সব প্রেরণা থেকে নিঃস্ব হয়ে তাঁর মৃত্যু মাত্র ৪১ বছরে, ১৯২১ সালে।]

নামহীন একটি কবিতা

তুষার গোধূলিতে একটি কালো কাক
রৌদ্রে পীত কাঁধে কৃষ্ণ মখমল
একটি সুরময় কণ্ঠে মৃদু গান
আমাকে শোনালো সে দক্ষিণাঞ্চলে রাত্তিরের গান।

হৃদয় লঘু, এলো কামনা বাধাহীন
সাগর যেন আজ জানালো সংকেত
অতল পাতালের থেকে অনন্তে
কীটেরা উড়ে যায় সঘন শ্বাস ফেলে।

বরফ-মেশা হাওয়া, তোমার নিশ্বাস
আমার নেশাখোর ওষ্ঠাধর···
ভ্যালেন্টিনা, তুমি স্বপ্ন, তারা !
তোমার দোয়েলেরা কেমনে গান গায়···

ভীষণা এ পৃথিবী ! বড়ই ছোট এই বুকের তুলনায় !
তোমার চুম্বনের প্রলাপ জড়ানো,
জিপসী গানে গানে অন্ধকার ফাঁদ,
আকাশে উল্কার সবেগে উড়ে যাওয়া।

সুরদেবীর উদ্দেশ্যে
(শেষ অংশ)

রাত্রি, রাজপথ, আলো, একটি ওষুধের দোকান
একটি অর্থহীন মিটমিটে বাতি।
যদি তুমি বেঁচে থাকো আরও এক সিকি শতাব্দীতে
সব কিছুই তবু এই রকম থাকবে। এর থেকে মুক্তি নেই।

তুমি মরে যাবে, আবার সব কিছু নতুন করে শুরু করে দেখো
সব কিছুরই পুনরাবৃত্তি হচ্ছে, সেই পুরনো কালের মতন ;
রাত্রি, খালের জলে বরফ-মেটানো ছোট ঢেউ, সেই
একটি ডাক্তারের দোকান, রাজপথ, সেই আলো ।

আনা অখমাতোফা

[রুশ দেশে সিম্বলিজম ও ফিউচারিজম এই দুই আন্দোলনের মাঝখানে আর সংক্ষিপ্ত কাব্যাদর্শ দেখা দিয়েছিল, যার নামকরণ হয়েছিল অ্যাকমেয়িজম, এর আয়ু মোটামুটি ১৯১০ থেকে ১৯১৭। সিম্বলিস্টদের বিরুদ্ধে এঁদের বক্তব্য এই ছিল যে, লৌকিক ও অলৌকিকের যোগাযোগের ধারণা ভুল, কবির যাবতীয় জ্ঞান এই মাটির পৃথিবীকে কেন্দ্র করেই। কবিতায় এঁরা শব্দের নানা অর্থ পরিহার করে নির্দিষ্ট একটি অর্থকেই প্রকাশ করতে চান। আফ্রিকার আদিবাসীদের গান, অজানা বিদেশী রীতির প্রতি রোমান্টিক মোহ, প্রেম, বীরত্ব, আত্মত্যাগ প্রভৃতি সরল বিষয় ছিল এঁদের বৈশিষ্ট্য। আনা অখমাতোফা এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়েই প্রথম রচনা শুরু করেন।

তাঁর জন্ম ১৮৮৮-তে। আসল নাম আনা আন্দ্রিয়েফনা গোরেঙ্কো। ২৬ থেকে ২৯ বছর বয়সের মধ্যেই তিনি প্রভূত সুনামের অধিকারিণী হয়েছিলেন। অ্যাকমেয়িস্ট দলের প্রধান কবি গুমিলেফের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। এর কিছু পরেই একটি পারিবারিক ট্র্যাজিডিতে তিনি আঠারো বছর কবিতা লেখা ছেড়ে চুপ করে ছিলেন। তাঁর স্বামী গুমিলেফ প্রথম মহাযুদ্ধের সময় অসম সাহসে লড়াই করেছেন, কিন্তু শেষ দিকে বলশেভিকদের বিরুদ্ধবাদী হয়ে পড়েন। সোভিয়েট ইউনিয়নের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগে কবি গুমিলেফকে গুলি করে মারা হয়।

দীর্ঘকাল পরে, দ্বিতীয়বার বিয়ে করে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় তিনি আবার কবিতা লিখতে শুরু করেন এবং সোভিয়েট রাশিয়ায় শ্রেষ্ঠ জীবিত কবির সম্মান পান। তাঁর 'নায়কহীন একটি কবিতা' নিউইয়র্ক থেকেও প্রকাশিত হয়েছে ১৯৬০ সালে।]

সায়হ্নে
(অংশ)

বাগান থেকে সুরের ধারা ছড়িয়ে যায়
        শব্দহীন ব্যথায়
টাটকা, কটু সাগর ঘ্রাণ ভেসে আসে
        বরফে গড়া পিরীচে রাখা ঝিনুকে।

সে বলেছিল, আমি তোমার আন্তরিক সখা—
        শুধু আমার পোশাকে তার হাত
আলিঙ্গনের চেয়েও এ যে অন্যরকম,
        একটুখানি ছোঁয়া।

এমনি করেই মানুষ তার পোষা বিড়াল, পাখি
ছুঁয়ে আদর করে
এমনি করেই মানুষ দেখে সার্কাসের নটী।
সোনালি তার লঘু চোখের শান্ত পাতার নিচে
রয়েছে শুধু হাসি।

আলগা ধোঁয়ার আড়াল থেকে বাজে করুণ বীণা
যেন আমায় বলে :
স্বর্গে জানাও নতি, কারণ আজই প্রথম তুমি
একা পেয়েছো তোমার দয়িতাকে।

'নায়কহীন একটি কবিতা' থেকে

১৯১৩-র সেন্ট পীটার্সবার্গ

ক্রীসমাস-জোয়ার উজ্জ্বল হয়েছে উৎসবের আলোয়,
শকট উল্টে যায় ব্রীজ থেকে, সমগ্র লোকের শহর
ভেসে যাচ্ছে কোন্ অজানা লক্ষ্যে, নেভা নদীর
নিম্ন স্রোতে অথবা উত্তরণে, যেখানেই হোক, তার
কবর থেকে অনেক দূরে। গ্যালারনায়া রাস্তার তোরণ
অন্ধকারে রেখাচিত্রার্পিত, গ্রীষ্মের বাগানে একটি আবহাওয়া-যন্ত্র
ধাতব সুরে গান গায়, উজ্জ্বল রূপালিচাঁদ হিম হয়ে
আসে রুশিয়ার রূপালি যুগে।
প্রতিটি রাজপথে একটি ছায়া ধীরে এগিয়ে আসে
প্রতিটি গুল্মের কাছে, সেইজন্য অন্ধকার
ঘনায় বসবার-ঘরে, খোলা-মুখ ফায়ার প্লেস থেকে
আর তাপ আসে না, ফুলদানিতে শুকিয়ে যায়
লাইলাক ফুল। এবং সমস্ত সময় জুড়ে দম আটকানো,
হিমশীতল, কামুক এবং অশুভ যুদ্ধপূর্ব দিনগুলির
বাতাসে একটি দুর্বোধ্য ঘর্ঘর শব্দ লুকানো···কিন্তু
সেই শব্দ তখন শূন্যগর্ভ শুনিয়েছিল···ঠিকমতো
কানে এসে পৌঁছোয়নি, হারিয়ে গেছে
নেভা-র তুষার-স্রোতে।
মানুষ যেন তখন আচ্ছন্ন, কোনো ভয়ংকর
রাত্তিরের আয়নায় সে নিজেকে তখন চিনতে চায়নি,
আর সেই প্রবাদময় নদীতীরে, ক্যালেণ্ডারের নয়,
বাস্তব বিংশ শতাব্দী এগিয়ে আসছিল।

বরিস পাস্তেরনাক

[পাস্তেরনাক সম্পর্কে বহু আলোচনা হয়ে গেছে, এখন তার পুনরুল্লেখ অবান্তর। মুখ্য তথ্যগুলি এই : জন্ম ১৮৯০, পিতা ছিলেন খ্যাতিমান চিত্রকর, প্রথম কবিতার বই বেরোয় ১৯১৪ সালে, কোনো সাহিত্য আন্দোলনের সঙ্গে নিজেকে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত করেননি, প্রায় ১৯৩৪ সাল থেকেই ১৯৫৩তে স্টালিনের মৃত্যু পর্যন্ত, যখন সরকারের পক্ষ থেকে সোভিয়েট রাশিয়ার লোকদের প্রতি নানান অনুশাসন জারি হতে থাকে, তিনি কবিতা লেখা বা প্রকাশ বন্ধ রেখেছিলেন, এই সময় বিদেশী সাহিত্যের বিশেষত শেক্সপীয়র অনুবাদ করেছেন। তাঁর উপন্যাস 'ডঃ জিভাগো' রাশিয়ায় নিষিদ্ধ হলেও গোপনে ইতালিতে ছাপা হয় ১৯৫৭ সালে, পরে ইংরেজিতে। ১৯৫৮-তে তাঁর নামে নোবেল পুরস্কার ঘোষণা ও প্রত্যাখ্যান, ১৯৬০-এ ভগ্নহৃদয় মৃত্যু। তাঁর রচনা রাশিয়ায় অন্যায় ভাবে নিষিদ্ধ করা এবং রাশিয়াকে সমালোচনা করার জন্য পশ্চিমী সভ্যতা তাঁর রচনাকে যে রকম অস্ত্রের মতন ব্যবহার করেছে—এই দুই বিষয়েই তিনি দুঃখ পেয়েছিলেন। বাংলায় পাস্তেরনাকের কবিতার সার্থক অনুবাদ করেছেন বুদ্ধদেব বসু। পাস্তেরনাকের একটি কবিতা সংগ্রহ বাংলায় অনুবাদ ও প্রকাশ করেছেন নচিকেতা ভরদ্বাজ।]

হ্যামলেট

ফিসফাস মিলিয়ে গেছে। আমি এসে মঞ্চে দাঁড়িয়েছি
দরজার ফ্রেমের গায় ভর দিয়ে কান পেতে শুনি
দূরাগত প্রতিধ্বনির ভিতরে কোন্ বাণী,
কোন্ উপাদান, গল্প আগুয়ান আমার জীবনে।

রাত্রির গ্রহণ-আলো এখন আমার মুখে স্থির
সহস্র অপেরা-গ্লাস এদিকে ফেরানো
যদি বা সম্ভব হয়, তবে আব্বা, পিতা,
এ-পেয়ালা আমার সম্মুখ থেকে নিয়ে যাও তুমি।

আমার পছন্দ হয় তোমার এ কঠিন রচনা
এই ভূমিকায় আমি অভিনয়ে যথেষ্ট সহজ
কিন্তু দেখো, এ সময় অন্য নাটকের মধ্য পথ—
এখন আমার সেই রূপান্তরে মুক্তি পেতে চাই।

যদিও প্রতিটি দৃশ্য সুচিন্তিত, পূর্ব নির্ধারিত
যেখানে শেষের অঙ্ক, সেখানেই অবিচল শেষ।
আমি একা, সব কিছু ডুবে যায় কপট বিশ্বাসে
মাঠের উপর দিয়ে হেঁটে যাওয়া—এক জীবন শেষ করা নয়।

শীতের রাত্রি

সারা পৃথিবীর উপর দিয়ে
ছড়িয়ে গেল তুষার,
ছড়িয়ে গেল প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত
মোমবাতিটা টেবিলের ওপর জ্বলে যায়
মোমবাতি জ্বলে।

যেমন আগুনের শিখার কে উড়ে যায়
গ্রীষ্মের পতঙ্গের ঝাঁক
বাইরের মিহি বরফ ঝাঁক বেঁধে ছুটে আসে জানলার দিকে।

হিম ঝঞ্ঝা বৃত্ত হয়ে ঘোরে,
তীর পাঠায় জানলার শার্সিতে
মোমবাতিটা টেবিলের ওপর জ্বলে যায়
মোমবাতি জ্বলে।

ঘরের উজ্জ্বল ছাদে ছায়া পড়ে ;
দু' দিকে মোড়া হাত, দু' দিকে মোড়া পা
দু' দিকে মোড়া নিয়তি।

ধপ্ করে শব্দ হয়ে দুটো জুতো পড়লো মাটিতে
পোশাকের ওপর কান্নার ফোঁটার মতন মোম
ঝরে পড়তে লাগলো রাত্রির আলো থেকে।

আর সব কিছুই হারিয়ে গেল
ধূসর-সাদা তুষার-কুয়াশায়
মোমবাতিটা টেবিলের ওপর জ্বলে যায়
মোমবাতি জ্বলে।

কোণ থেকে ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝাপটা এসে লাগলো
মোমের শিখায়
তখনি পরীর মতন, লোভের উত্তাপ তুলে ধরলো দুটি ডানা
ক্রুশকাষ্ঠের ভঙ্গিতে।

বারবার মোমবাতিটা টেবিলের ওপর জ্বলে যায়
মোমবাতি জ্বলে।

ভ্লাদিমির মায়াকভ্স্কি

['জনতার রুচির গালে এক থাপ্পড়'—এই নামে একটি ইস্তাহার বেরুলো ১৯১২ সালে। নতুন সাহিত্য অভিযান শুরু করে যে চারজন তরুণ কবি এই ইস্তাহারে স্বাক্ষর করেছিল তাদের মধ্যে ১৯ বছরের ছোকরা মায়াকভ্স্কিই সবচেয়ে তেজি। ইতালির মেরিনেত্তি যে ফিউচারিস্ট আন্দোলন শুরু করেছিলেন, তার প্রভাব এসে পড়ে রাশিয়ায়, কবিতার পূর্ব সংস্কার ভেঙে একদল কবি বিপ্লব করলেন। যা কিছু তথাকথিত কবিত্বময়, প্রথাসিদ্ধ সুন্দর, সেইসব আবরণ খুলে ফেলে এঁরা কবিতাকে রক্তমাংসের, সমসাময়িক জীবনের ও যথাযথ আবেগের প্রকাশ হিসেবে দেখতে চাইলেন। তারপর ১৯১৭ সালে এসে গেল রুশ বিপ্লব। মায়াকভ্স্কির মধ্যে একটা বেপরোয়া, তেজি, উদ্দাম-হৃদয় ছিল, তিনি ঝাঁপিয়ে পড়লেন বিপ্লবের মধ্যে। এবং রুশ বিপ্লবের শ্রেষ্ঠ কবি হিসেবে স্বীকৃত হলেন। তাঁর জোরালো ও উচ্চকণ্ঠ শব্দ ও ছন্দ ব্যবহারের ক্ষমতা ও ঝোঁক, তাঁর কবিতাকে বিপ্লবের প্রেরণা হিসেবে জনতার কাছে পৌঁছে দেয়।

কিন্তু এ কথা ভুললে চলবে না, বিপ্লবীরা আসলে জন্মরোমান্টিক। সাম্যবাদী বিপ্লবের মধ্যে রোমান্টিকতার স্থান সামান্য, কিন্তু যে সমস্ত কবি ও লেখক প্রথমে এই বিপ্লবে যোগ দিয়েছিলেন, তাঁরা সকলেই এসেছিলেন এক প্রকার রোমান্টিক প্রেরণাবশত। এইজন্যই এইসব সাহিত্যিকারদের মধ্যে অবিলম্বেই আত্মহত্যা, নির্বাসন ও স্বপ্নভঙ্গের হিড়িক পড়ে যায়। বিপ্লবের মধ্যে একটা প্রবল ভাঙাচোরা আছে— যা শিল্পকে সব সময়ই আকর্ষণ করে, কিন্তু পরবর্তী গঠনের যুগে শিল্পী নিশ্চিত খানিকটা উদাসীন। কারণ, তাঁর বুকের মধ্যে ব্যক্তিগত বিপ্লব থেকেই যায়। বিপ্লবের কবিতাগুলির জন্যই মায়াভ্স্কি বিখ্যাত, কিন্তু তাঁর প্রেমের কবিতাবলী, ভয়ংকর আবেগ, আত্মঘাত, অপমানবোধ, ক্রোধ ও করুণা প্রার্থনা— ইত্যাদির মিশ্রণে পৃথিবীতে অনন্যস্বাদ।

১৯৩০ কালে মায়াভ্স্কি আত্মহত্যা করেন। বয়েস মাত্র ৩৭, তখন তিনি খ্যাতি ও সম্মানের উচ্চশিখরে। তাঁর নোট বইয়ের মধ্যে যে ক'টা অসমাপ্ত কবিতা পাওয়া যায়, তার দুটি টুকরোও আমরা এখানে উপস্থিত করেছি।]

আমাদের যাত্রা

বিপ্লবের দামামা বেজে উঠুক ময়দানে
উচ্চে তোলো সারবন্দী অহংকারী মাথা
বিশ্বময় সব শহর ভাসিয়ে দেবো বানে
দ্বিতীয় মহাপ্রলয় আজ ছড়াবে সবখানে।
দিনের বাহন হেলে পড়েছে অতি
বৎসরের গরুর গাড়ি ঢিমে
গতি আমাদের দেবতা, শুধু গতি
হৃদয়গুলি দামামা সম্প্রতি।

আমরা সোনার চেয়েও দামী, জানি
বুলেট যেন ভ্রমণ, বুকে বেঁধে না
গানে আমরা হয়েছি শস্ত্রপাণি
গলার সুরে সোনালি ঝনঝনা।
ধূসর মাঠ, আনো তোমার সবুজ
দিনের জন্য পথ বানাও ঘাসের
হে রামধনু, এবার নীলাকাশের
ঘোড়া ছোটাও বৎসরের, সঘন নিশ্বাসের।

তারায় ভরা আকাশ আজ ম্লান
ওদের ছাড়াই আমরা লিখি গান।
সপ্ত ঋষি! শোনো এ দাবী জানাই
আমরা স্বর্গে জীবন্ত যেতে চাই!
চালাও ফুর্তি! গান করো! উৎসব!
বসন্ত ঋতু প্রত্যেক ধমনীতে
হৃদয় এখন তোলো যুদ্ধের রব
ধাতুর দামামা হৃদয়ের বৈভব।

অসমাপ্ত

২
এখন রাত একটা
তুমি নিশ্চয়ই বিছানায় শুয়ে আছো
অথবা, হয়তো, তুমিও আমার মতো…
আমার কোনো তাড়াহুড়ো নেই।
এখন কোনো মানে হয় না, এক্সপ্রেস টেলিগ্রাফ পাঠিয়ে
তোমাকে জাগিয়ে তোলা বা বিরক্ত করার—

৫
আমি জানি শব্দের ক্ষমতা, আমি জানি শব্দের মাদকতা
সেই শব্দ নয়, যা থিয়েটারে হাততালি পায়,
সেই শব্দ যা কফিন ফেটে বেরিয়ে দারুময় চার পায়ে হাঁটে
কখনো কখনো লোক তোমাকে বাতিল করে, ছাপা হয় না, প্রকাশক জোটে না
কিন্তু শব্দ তো অশ্বারোহী, বল্গা দৃঢ় করে ছুটে যায়
শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বাজে সেই শব্দ

রেল ট্রেনও একসময় হামাগুড়ি দিয়ে আসে কবিতার
বিবর্ণ হাতে চুম্বন করার জন্য।
আমি জানি শব্দের ক্ষমতা। কখনো তাকে দেখায় খুব সাধারণ
নর্তকীর পায়ের কাছে ঝরে পড়া পাপড়ির মতন
কিন্তু মানুষ তার নিজের আত্মায়, ওঠে, হাড়ের মধ্যে···

সার্গেই এসেনিন

আমার মা-কে লেখা চিঠি

বুড়ি, তুমি কি এখনো বেঁচে রয়েছো ?
আমিও বেঁচে আছি। আমি তোমায় ভালোবাসি
আমি তোমায় আশীর্বাদ করি তোমার ছোট্ট ঐ বাড়িতে
বাণীর অতীত সায়াহ্নের আলোক ঝরে পড়ুক !
লোকে আমায় চিঠি লিখেছে, তোমার চোখে মুখে
—যদিও খুব লুকোতে চাও, —উৎকণ্ঠা, ভয়
আমার জন্য, আমার জন্য অধীর প্রতীক্ষায়
তোমার নাকি জীবন কাটে ? বেরিয়ে এসে পথে
পুরনো কাঁথা শরীরে মুড়ে আমার জন্য তাকিয়ে থাকো দূরে ?
কখনো বুঝি সন্ধেবেলা নীল অন্ধকারে
হৃদয় কাঁপে আশঙ্কায়, প্রতিদিনের একই আশঙ্কায়
সরাইখানার মারামারিতে এই বুঝি কেউ আমার
বুকের মধ্যে ধারালো একটা ছুরি বসিয়ে দিল !
বুড়ি, আমার মামণি, তুমি ভয় করো না, এসব
কিচ্ছু না, এ তো শুধুই ঘূর্ণী, মায়ার খেলা।
আমি কি এমন পাঁড় মাতাল হয়ে গিয়েছি, ভাবো ?
তোমায় শেষ দেখার আগেই হঠাৎ মরে যাবো ?
আমি তোমার আগের মতোই ভালোবাসার আছি
এখন আমার দিবস জুড়ে একটি মাত্র স্বপ্ন
কখন আমি অস্থিরতা, দুঃখ ছিঁড়ে বেরিয়ে
তোমার কাছে গ্রামের সেই বাড়িতে ফিরে যাবো।
ফিরবো আমি, যেদিন তোমার ছোট্ট সাদা বাগান
বসন্তের অনুকরণে ছড়াবে বহু শাখা
তখন যেন খুব সকালে ঘুম ভাঙিয়ে দিও না তুমি আমার
যেমন তোমার স্বভাব ছিল আট বছর আগে।
যে সব স্বপ্ন মিলিয়ে গেছে তাদের জাগিয়ো না

যে সব সাধ সত্য হয়নি, তাদের ছুঁয়ে কি লাভ !
আমার এই নিয়তি ছিল, এমন দুঃখ পাওয়া
জীবন আমার শুরুই হলো যন্ত্রণার দিনে ।
আমাকে তুমি বলো না আমার প্রার্থনার মন্ত্র,
অতীত কালে ফেরা আবার অসম্ভব আমার ।
তুমিই শুধু একা আমার সাহায্য ও শান্তি
তুমিই শুধু আমার কাছে বাণীর অতীত আলো ।
আমার জন্য অমন আর ভাবনা করবে না তো ?
অমন করে থেকো না আর আমার প্রতীক্ষায়
দুয়ার খুলে বেরিয়ে এসে পথের দিকে চেয়ে
পুরনো কাঁথা শরীরে মুড়ে দাঁড়িয়ো না আর তুমি ।

শেষ কবিতা

হে বন্ধু, বিদায়
প্রিয় বন্ধু, তুমি আছো আমার হৃদয়ে…
আমাদের পূর্বনির্ধারিত এই বিদায় মুহূর্ত
ধরে আছে ভবিষ্যতে মিলন শপথ ।
বিদায়, হে বন্ধু, কোনো কথা নেই, হাতে নেই হাত
দুঃখিত হয়ো না, শোকে বাঁকিয়ো না ভুরু
এ জীবনে মৃত্যুর ভিতরে কোনো নতুনত্ব নেই
অবশ্য একথা ঠিক, বেঁচে থাকা খানিকটা অভিনব বটে ।

[যদিও মা-কে লেখা চিঠিতে এসেনিন বলেছিলেন, আমি সে-রকম বদ্ধ মাতাল হইনি যে তোমার সঙ্গে দেখা না করে হঠাৎ মরে যাবো— কিন্তু তিনি কথা রাখেননি । এলোমেলো দুর্দান্ত স্বভাবের লোক ছিলেন এসেনিন, হঠাৎ নাটকীয় ভাবে বিয়ে করলেন ইসাডোরা ডানকানকে । কিন্তু শিল্পের সৃষ্টি ও মানুষের জীবনকে ধ্বংস করার জন্যই তো ওসব নারীর জন্ম । সারা পৃথিবীকে তখন অকপট সৌন্দর্যের স্পন্দন কাঁপিয়ে দিয়েছিল যে নারী, তাকে বিয়ে করলো এক সাতাশ বছরের কবি । ইসাডোরার বয়স তখন চল্লিশ পার এবং অন্তত চল্লিশ জন পুরুষকে নিভৃতে দেখেছেন । সেই বিবাহ বন্ধন টিকে ছিল মাত্র দেড় বছর । এর পর থেকে এসেনিন অবিরাম মদ্যপান শুরু করেন, জীবনযাত্রার সমস্ত নিয়ম ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় । তারপর একদিন লেলিনগ্রাডেত এক হোটেলে হাতের শিরা কেটে ফেললেন । নিজের হাত থেকে বেরিয়ে আসা ফোয়ারার মতন রক্তধারায় কলম ডুবিয়ে লিখলেন শেষ কবিতা । তারপর নিশ্চন্ত হয়ে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করলেন । তখন কবির বয়েস মাত্র ৩০, তখন ১৯২৫ সাল ।

এসেনিনের জন্ম ১৮৯৫-তে, বয়েসের হিসেবে তিনি যদিও পাস্তেরনেক বা মায়াকভ্স্কির পরে, কিন্তু এসেনিন যেন রাশিয়ান কবিতার একটি হারিয়ে যাওয়া অধ্যায় । তখন মায়াকভ্স্কির প্রবল প্রতাপ, এসেনিন তাঁর নেতৃত্ব বা প্রভাব মানতে চাননি, তিনি এজরা পাউণ্ড প্রভৃতি ইমেজিস্টদের

ধরনের আন্দোলন আনতে চাইলেন রাশিয়ায়। কিন্তু তাঁর মানসিকতা ছিল অন্যরকম, ফলে এই দ্বিধার মধ্যে তাঁর কবিতা যথার্থ মর্যাদা পরবর্তীকালে পায়নি। এসেনিন বর্তমান অনুবাদকের প্রিয় কবি।

এসেনিন ছিলেন চাষার ছেলে, নাগরিকতার সবগুলো বিষ গ্রহণ করেও তিনি গ্রামের শ্যামলতার জন্য চিরদিন উন্মুখ ছিলেন। রুশ বিপ্লবের সময় তিনি সাগ্রহে অংশ গ্রহণ করেন এবং শ্রেণীহীন সমাজ ছিল তাঁর কাম্য। কিন্তু দেশের অগ্রগতির জন্য যখন গ্রাম ভেঙে আধুনিক কলকারখানা, বিদ্যুৎ ইত্যাদি তৈরি শুরু হয়, তখন তিনি অযৌক্তিক ভাবে কিছুটা নিরাশ হয়েছিলেন। দেশের উন্নতির জন্য অরণ্য বিনাশ করে ইস্পাত কারখানা স্থাপন করা দরকার, কিন্তু তবুও দু-একজন কবি থেকে যাবেই যারা ইস্পাতের সমস্ত উপকারিতা ভোগ করেও সেই লুপ্ত অরণ্যের জন্য শোক করবে। বন্যা বন্ধ করার জন্য নদীতে বাঁধ দিতেই হবে, তবু দু-একজন কবি নদীর সেই উগ্র, ভয়ঙ্কর রূপ আর দেখতে পাওয়া যাবে না ভেবে দীর্ঘশ্বাস ফেলবেই, তা বলে, এদের প্রগতির বা সভ্যতার শত্রু বলা যাবে না, এরাই 'ধনুকের ছিলা রাখে টান'।]

এফগেনি এফতুশেংকো

[রুশ বিপ্লবের বছর পনেরো পর থেকেই শুরু হয় রাশিয়ার সাহিত্যের সবচেয়ে দুঃসময়ের কাল। সাহিত্যের ওপর আদর্শবাদের জুলুম এসে সৃষ্টিশীল লেখকদের চুপ করিয়ে দেয়। ১৯৪৯ সালে সমস্ত সাহিত্যের গ্রুপগুলোকে জোর করে ভেঙে তৈরি হয় একমাত্র রাষ্ট্রশাসিত 'সোভিয়েট লেখক সমিতি' এবং যেসব রচনায় সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদের স্পষ্ট ছাপ নেই, তা তৎক্ষণাৎ বাজেয়াপ্ত হতে থাকে। এই সময়ই আইশাক বাবেল তিক্ত হাস্যে বলেছিলেন, এখন খাঁটি লেখকদের দেখাতে হবে, হিরোইজম অফ সাইলেন্স। ততদিনে এসেনিন এবং মায়াকভ্স্কি আত্মহত্যা করেছেন, পাস্তেরনাক ও অখমাতোফা চুপ।

স্টালিনের শিল্প-বিরোধ শাসন ও লাভেন্তি বেরিয়ার পুলিস চক্র শেষ হলে জেগে ওঠে রাশিয়ার দ্বিতীয় লেখক সম্প্রদায়। এরা বিপ্লব চোখে দেখেনি, বিপ্লবের পরবর্তী দুঃখ ও নিষ্পেষণ সহ্য করেনি, এরা সুসময়ের ফসল ভোগ করছে। সুতরাং শিল্পে সাহিত্যে এরা স্বাধীনতা ও বিশ্ব আত্মীয়তার দাবি জানিয়েছিল। এই নবীন দলের প্রধান কবি এফতুশেংকো এবং ভজনেসেনস্কি। ক্রুশ্চফের আমলে পশ্চিমের জানলা কিছুটা খুলে যায়, রুশ সংস্কৃতিদলের সঙ্গে ইওরোপ ভ্রমণ করার সময় এফতুশেংকো রাশিয়ার বাইরে সারা পৃথিবীতে পরিচিত হন। প্যারিসের একটি পত্রিকায় তাঁর অতিসচেতন আত্মজীবনী ছাপা হতে থাকে।

তরুণ এফতুশেংকোর কবিতা সরল ও ধ্বনিপ্রধান। তাঁর কবিতার বই লক্ষ লক্ষ কপি বিক্রি হয়েছে, হাজার হাজার লোক শুনেছে তাঁর কবিতা পাঠ। তাঁর আবেগ সহজে মর্মভেদ করে। তিনি এমন কথাও বলেছিলেন, আমি কম্যুনিজম জানি না, ভালোবাসা জানি। ইয়ং কমিনিস্ট লিগ থেকে তাঁর নাম কেটে দেওয়া হয়েছিল, তাও গ্রাহ্য করেননি।

কিন্তু ক্রুশ্চফকে যতটা উদার মনে করা হয়েছিল, শেষদিকে সে ধারণা তিনি নিজেই ভেঙেছেন। একটি চিত্র-প্রদর্শনীতে তাঁর ফিলিস্টিনিজম নিশ্চয়ই সকলের মনে আছে। অতিরিক্ত স্বাধীনতার বাড়াবাড়ির জন্য পশ্চিম ভ্রমণের মাঝপথেই এফতুশেংকোকে দেশে ফিরিয়ে এনে ধমকে দেওয়া হয়। ক্ষমা প্রার্থনা করে এফতুশেংকো কম্যুনিজম ও সোভিয়েট রাশিয়ার প্রতি পূর্ণ আনুগত্য জানান। তাঁর কবিতা এখনো তারুণ্যের দীপ্তি ও দুঃসাহসময়।]

সীমান্তের বিরুদ্ধে

পৃথিবীর সব সীমান্ত আমায়
বিরক্ত করে।
আমার বিশ্রী লাগে যে আমি কিছুই জানি না
বুয়েনোস এয়ারিস কিংবা নিউ ইয়র্ক
সম্পর্কে।
আমার ইচ্ছে করে এলোমেলোভাবে
ঘুরে বেড়াই লণ্ডনের পথে পথে,
কথা বলি মানুষের সঙ্গে আমার ভাঙা ভাঙা
ভাষায়।
বালকের মতন আমার ইচ্ছে হয়
সকালবেলার প্যারিসে
বাসে চড়ে বেড়াতে।
এবং,
আমি চাই একটি শিল্প
যা আমারই মতন
পরিবর্তনশীল।

একটি কবিতা

আমি ভিজে মাটির ওপর শুয়ে থাকবো
আমার কোদালটাকে জড়িয়ে।
মুখের মধ্যে একটা ঘাসের শিস
টক টক ঘাস।
এই অভিশপ্ত জমিকে খুঁড়তে খুঁড়তে
এত জোড়ে—যাতে কোদালটা ভেঙে যাবে
ক্লান্ত হয়ে আমি ঘুমিয়ে পড়বো,
কিন্তু ঘুমের প্রশ্নই তো ওঠে না।
'কী ?
নিজের পায়ে দাঁড়াতেও পারো না ?
দেখো তো ঐ ছোট্ট পাখিটাকে !'
আকাশ-নীল ব্লাউজ আর বুট পরা মেয়েটির
কাছ থেকে এই বিদ্রূপ ভেসে আসে।
এবার সে একটা বিরক্তিকর গান শুরু করবে :

'যেদিন পাবো প্রিয় তোমায়
সারা শরীরে নখের দাগ বসাবো'—
তার ধূসর রঙা কোদালটা হাওয়ায় ঝলসিয়ে
কানের দুলে ঝুমঝুমে শব্দ করে
সে এইরকম চালিয়ে যাবে— যতক্ষণ না
ছেলেরা গুমরে গুমরে ওঠে।
প্রত্যেকেই হাসবে :
'সাপিনী একটা !
আংকা, একটু চুপ করতে পারো না !'
শুধু আমি জানি,
আকাশের তারা এবং লেবুর ঝোপ জানে
যখন সে আমার সঙ্গে রাত্রি বেলা অরণ্যে যায়
লেবুর গন্ধময় রাত্রে সে কেমন নিঃশব্দে
হাত দিয়ে ঘাসগুলোকে সরায়
মাতালের মত অসংবদ্ধ ওর পদক্ষেপ
কি দুর্বল আর অসহায়,
রৌদ্র-তাম্র হাত দু'খানি ঝুলিয়ে
সে আমার সঙ্গে কথা বলে সুন্দর বিভ্রান্ত ভাষায়··· ।

আন্দ্রেই ভজনেসেনস্কি

স্থাপত্য বিদ্যালয়ে আগুন

স্থাপত্য বিদ্যালয়ে আগুন লেগেছে !
সেই হলঘরগুলি
সেই সব রেখাচিত্র, সব
জায়গায় আগুন, মার্জনার চিঠির
মতন, আগুন ! আগুন !

লাল-নিতম্ব গোরিলার মতন
ঐ উঁচুতে ঘুমন্ত কার্নিসে—
জানলা ভেঙে যায়, গর্জন করছে ঝাঁপিয়ে
পড়ার জন্য, আগুনে !

আমরা ফাইনাল পরীক্ষার জন্য
পড়াশুনো করছিলুম, হ্যাঁ, আমাদের
উচিত, আমাদের খাতাপত্র, থিসিস

বাঁচানো ! আমার গবেষণাগুলো
এর মধ্যেই ফাটতে শুরু করেছে তালাবন্ধ
সিন্দুকে—
বিরাট একটা কেরোসিনের বোতলের মতন
পাঁচটা গ্রীষ্ম, পাঁচটা শীত
হুস করে জ্বলে উঠলো শিখায়
হে আমার মধুর যৌবন
আঃ, আমরা এখন আগুনে পুড়ছি !

পরীক্ষায় টুকলি করার জন্য ছোট ছোট
কাগজে নোট, উৎসব, দল, সব গেলো,
যাচ্ছে, এই যে গেলো, উঁচুতে উঁচুতে
লক্‌লকে শিখায়—
তুমি ঐখানে রইলে, ট্যাপারির ঝোপে
একটি ছিটে গোলাপি
বিদায় ! বিদায় !
বিদায় স্থাপত্য
বিদায় আগুনের শিখায়
শিশু কন্দর্পদের ছোট ছোট গোয়ালঘর
প্রাচীন জমকালো সেভিংস ব্যাঙ্ক, তোমাদের বিদায়
হে যৌবন, হে ফিনিক্স
হে মূর্খ, তোমার সার্টিফিকেটগুলো যে
সব আগুনে পুড়ে গেল !
হে যৌবন, লাল স্কার্টের মধ্যে তোমরা
তোমাদের পেছন দোলাচ্ছো, হে যৌবন
তোমরা বক্‌বক্ করে জিভ দোলাচ্ছো—

বিদায়, সীমানার কাল,
মাপজোক, জীবন এই রকম
এক জ্বলন্ত উৎসব থেকে অন্য প্রজ্জ্বলনে
যাতায়াত, আমরা সবাই আগুনের মধ্যে—
তুমি বেঁচে আছো—তুমি আগুনে জ্বলছো,

কোন্ ঘোরানো কল, কোন্ স্তম্ভ জেগে উঠবে
এই আগুন থেকে—
ট্রেসিং পেপারের ওপর দিয়ে প্রথম স্কী করার

দাগের মতন ছুটে যাওয়া ?

কিন্তু কাল, অশুভ পাখির মতন কিচির মিচির করে,
ভোমরার চেয়ে বেশী রাগী,
এক মুঠো ছাইয়ের মধ্যে দেখা যাবে কম্পাসটাকে
হুল ফোটাবে...

সব কিছু পুড়ে ছাই হয়ে গেছে,
বাঃ
সবাই এবার বুক ভরে নিঃশ্বাস নাও ।
সব কিছু শেষ ?
        সব কিছুর শুরু হলো
এবার চলো, আমরা
সিনেমা দেখতে যাই !

[রাশিয়ার যে তরুণ কবিকুল সাম্প্রতিক চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে, তাঁদের মধ্যে ভজনেসেনস্কি কনিষ্ঠতম, এবং এখন সমালোচকদের বিচারে, তিনিই ঐ তরুণ দলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কবি । এফতুশেংকো নেতা হিসেবে প্রচুর সম্মান ও প্রচার পেয়েছেন কিন্তু শব্দজ্ঞানে ও কবিত্বে ভজনেসেনস্কিই পাঠকদের কাছে স্থায়ী আসন পাবার যোগ্য । তাঁর বয়েস এখন তিরিশ পেরিয়েছে । ১৯৬০ সালে লেখা এই কবিতাটিই তাঁকে সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয় করেছে, বহুদিন পর রাশিয়ার কবিতায় আবার দেখা গেলো যে অগ্নিকাণ্ডের জয়গান করা হয়েছে, ভাঙন নিয়ে উল্লাস ও ইয়ার্কি করা হয়েছে । শুধু সৃষ্টি, সংগঠন, সংঘবদ্ধতার নামে জয়ধ্বনি তোলা— যা ছিল সোভিয়েত সাহিত্য সম্পর্কে সরকারি নীতি, তার বাইরে বেরিয়ে এলেন এই যুবা কবিবৃন্দ । যৌবন বয়সের সাহিত্য ভাঙার দিকে যাওয়াই স্বাভাবিকধর্ম—যে কোনো দেশে ।]